ইসলামের বাস্তব কাহিনী
হযরাতুল আল্লামা আবুল নুর মুহাম্মদ বশীর (রহ:)
মুহাম্মদী কুতুবখানা
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
www.AmarIslam.com
http://khasmujaddedia.wordpress.com/

আমাদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত গ্রন্থাদি পড়ে ঈমান আক্বীদা মজবুত করুন

বই	লেখক
১। জা'আল হক	মুফ্তী আহ্মদ ইয়ার খান নঈমী
২। শানে হাবীবুর রহমান	"
৩। সালতানতে মুস্তাফা	"
৪। আউলীয়া কিরামের ওসীলায় খোদার রহমত	"
৫। দরসুল কুরআন	"
৬। অপব্যাখ্যার জবাব	"
৭। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ)	"
৮। ইসলামী জিন্দেগী	"
৯। কনযুল ঈমান (তরজুমা কুরআন)	আলা হযরত শাহ্ আহমদ রেযা খান বেরলভী
১০। ঈমানের সঠিক বিশ্লেষণ	"
১১। মাতা-পিতার হক	"
১২। বাহারে শরীয়ত	মুফ্তী আমজাদ আলী
১৩। কানুনে শরীয়ত	মুফ্তী শামসুদ্দীন আহমদ রিজভী
১৪। কারবালা প্রান্তরে	আল্লামা শফি উকাড়বী
১৫। যলযালা	আল্লামা আরশাদুল কাদেরী
১৬। আমাদের প্রিয় নবী	আল্লামা আবেদ নিযামী
১৭। ইসলামের বাস্তব কাহিনী	আল্লামা আবুন-নূর-বশীর
১৮। যিয়ারতে আজমীর	অধ্যাপক লুৎফুর রহমান
১৯। ইসলাম ও গান বাজনা	মাওলানা নুরুল হক
২০। হামদে খোদা ও নাতে রসূল	মাওঃ মুহাম্মদ আলী

মুহাম্মদী কুতুব খানা

আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬১৮৮৭৪

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

মূল ঃ সুলতানুল ওয়ায়েজীন হযরত আল্লামা
আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর

অনুবাদ ঃ অধ্যাপক মুহাম্মদ লুৎফুর রহমান

মুহাম্মদী কুতুবখানা
৪২, শাহী জামে মসজিদ মার্কেট
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১ ৮৮ ৭৪

প্রকাশক ✻
আরিফুর রহমান নিশান
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ৬১ ৮৮ ৭৪

প্রকাশকাল ✻ ০১/০৩/০৭ ইং

শব্দ বিন্যাশ ✻
এনামস প্রিন্টার্স এন্ড কম্পিউটার
৩৯, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্লেক্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
মোবাইল ঃ ০১৭-৩০৭৬০২

হাদিয়া ✻ ৭৫.০০ টাকা

মুদ্রণে ✻
আনন প্রেস
নাজির আহমদ চৌধুরী রোড
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

পেশ কালাম

আজকালকার সমাজের সিংহ ভাগ নারী পুরুষ, বড় ছোট নির্বিশেষে প্রায় সবাই নাটক উপন্যাস, কিচ্ছা কাহিনীর বই খুবই আগ্রহ সহকারে পড়ে থাকে। কিন্তু ধর্মীয় বই পড়ার প্রতি ততটা আগ্রহ দেখা যায় না। অথচ ওসব বই পুস্তকে বর্ণিত প্রায় ঘটনা-কাহিনী নিছক কল্পনা ছাড়া আর কিছু নয়। বাস্তবের সাথে ওগুলোর কোন মিল নেই। তাছাড়া এসব মনগড়া ও কাল্পনিক কাহিনী পড়ে অনেকেই বিপদগামী হচ্ছে এবং এর কুপ্রভাবে সমাজ কলুষিত হচ্ছে।

সমাজের এ দুরাবস্থা দেখে পাকিস্তানের প্রখ্যাত আলেমেদ্বীন হযরত আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর সাহেব কুরআন, হাদীস ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে বিভিন্ন কাহিনী ও ঘটনাবলী সংগ্রহ করে 'সাচ্চি হেকায়াত' নামে উর্দু ভাষায় ৫ খন্ড বিশিষ্ট একটি কিতাব প্রণয়ন করেন, যাতে গল্প কাহিনীর প্রতি আগ্রহী পাঠকবৃন্দ এ কিতাবে বর্ণিত বাস্তব কাহিনী গুলো পাঠ করে উপকৃত হতে পারে। তাঁর সংগৃহীত প্রতিটি কাহিনী শিক্ষণীয়। উল্লেখ্য যে প্রতিটি কাহিনীর পর তিনি শিক্ষনীয় বিষয়টা আলাদাভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর অন্যান্য কিতাবগুলোর মত এটাও পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে।

বাঙালী সমাজও যেহেতু একই রোগে আক্রান্ত, সেহেতু কিতাবটি বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য খুবই প্রয়োজন মনে করে এর অনুবাদে হাত দিয়েছি। প্রথম প্রয়াস হিসেবে 'ইসলামের বাস্তব কাহিনী' নামকরণ করে প্রথম খন্ড বের করলাম। এভাবে ক্রমান্বয়ে বের হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। এ খন্ডে আল্লাহর একত্ববাদ, প্রিয় নবীর মান-মর্যাদা ও অন্যান্য নবীগণের শানমান সম্পর্কিত বিভিন্ন কাহিনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পরবর্তী খন্ড গুলোতে খোলাফায়ে রাশেদীন, সাহাবায়ে কিরাম, আহলে বায়তে এ জাম, আইম্মায়ে কিরাম ও ইসলামী রাজা বাদশাহ সম্পর্কিত নানা কাহিনী স্থান পাবে।

আশা করি পাঠক মহল বইটি আগ্রহ সহকারে পড়বেন ও উপকৃত হবেন।

অনুবাদক

সূচী

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদ সম্পর্কিত কাহিনী

দ্বিতীয় অধ্যায়

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কিত কাহিনী

তৃতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কিত কাহিনী

ইসলামের বাস্তব কাহিনী

প্রথম অধ্যায়

আল্লাহু তাআলার অস্তিত্ব ও একত্ববাদ

কাহিনী নং -১

হযরত ইমাম আযম (রাদিআল্লাহু আনহু) এর সাথে এক নাস্তিক পন্ডিতের বিতর্ক

একবার আল্লাহর অস্তিত্বে অস্বীকারকারী এক নাস্তিকের সাথে আমাদের ইমাম হযরত আবু হানিফা (রাদিআল্লাহু আনহু) এর মুনাজেরা হয়েছিল। মুনাজেরার বিষয় ছিল- পৃথিবীর কোন সৃষ্টিকর্তা আছে কিনা। এতবড় ইমামের সাথে এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের মুনাজেরা দেখার জন্য শত্রু-মিত্র সবাই যথা সময়ে মুনাজেরার স্থানে সমবেত হয়ে গেল। নাস্তিক লোকটিও যথাসময়ে পৌঁছে গেল। কিন্তু হযরত ইমাম আযম নির্ধারিত সময়ের অনেক দেরীতে সমাবেশে তশরীফ আনলেন। নাস্তিক পণ্ডিত ব্যক্তিটি জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এত দেরী করলেন কেন? তিনি বললেন, জংগল দিয়ে আসার সময় এক অদ্ভুত ঘটনা চোখে পড়লো, সেটা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে ছিলাম। ঘটনাটি হলো, নদীর কিনারে একটি বৃক্ষ ছিল। দেখতে দেখতে সেই বৃক্ষ নিজেই কেটে পড়ে গেল, এরপর নিজেই তক্তায় পরিণত হলো, অতঃপর সেই তক্তাগুলো নিজেরাই একটি নৌকা হয়ে গেল এবং সেই নৌকা নিজে নদীতে নেমে গেল এবং নিজেই নদীর এপাড় থেকে ওপাড়ে যাত্রী আনা নেয়া করতে লাগলো এবং নিজেই প্রত্যেক যাত্রী থেকে ভাড়া আদায় করতে ছিল। এ দৃশ্যটি দেখতে গিয়ে আমার দেরী হয়ে গেল। নাস্তিক পণ্ডিত এটা শুনে অট্টহাসি দিল এবং বললো, আপনার মত একজন বুজুর্গ ইমামের পক্ষে এ রকম জঘন্য মিথ্যা বলা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। এ রকম কি নিজে নিজে কিছু হতে পারে? কোন কারিগর না থাকলে, এ রকম কাজ কিছুতেই হতে পারে না।

হযরত ইমাম আযম বললেন, এটাতো কোন কাজই না। আপনার মতে তো এর থেকে অনেক বড় বড় কাজ এমনিতে হয়। এ পৃথিবী, এ আসমান, এ চাঁদ, সূর্য, তারকারাজি, বাগান সমূহ, রং বেরং এর নানা রকম ফুল, সুমিষ্ট ফল, এ পাহাড় পর্বত, জীব জন্তু,

মানব দানব সব কিছু কোন সৃষ্টি কর্তা ব্যতীত এমনিতে হয়ে গেছে। যদি একটি নৌকা কোন কারিগর ছাড়া এমনিতে তৈরী হয়ে যাওয়াটা মিথ্যা হয়, তাহলে সমস্ত পৃথিবীটা সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত নিজে নিজেই তৈরী হয়ে যাওয়াটা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কি হতে পারে?

নাস্তিক পণ্ডিত তাঁর এ বক্তব্য শুনে বিমোহিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করে মুসলমান হয়ে গেল। (তাফসীরে কবীর ২২১ পৃঃ ১ম জিলদ)

সবক ঃ এ বিশ্বের নিশ্চয়ইএকজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যার নাম আল্লাহ। আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকার যুক্তিরও বিপরীত।

কাহিনী নং-২

হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদিআল্লাহু আনহু) ও এক নাস্তিক নাবিক

এক নাস্তিক নাবিকের সাথে হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদিআল্লাহু আনহু) এর বিতর্ক হয়েছিল। সে নাবিক বলতো যে আল্লাহ বলতে কিছু নেই (মাজাল্লা)! হযরত ইমাম জাফর ছাদেক (রাদিআল্লাহু আনহু) ওকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনিতো জাহাজ চালক, সমুদ্রে কি কখনো তুফানের সম্মুখীন হয়েছিলেন? সে বললো, হ্যাঁ, আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে যে একবার আমার জাহাজ সমুদ্রের ভয়ানক তুফানে পতিত হয়েছিল। হযরত জাফর ছাদেক জিজ্ঞেস করলেন এরপর কি হয়েছিল? সে বললো, আমার জাহাজ ডুবে গিয়েছিল এবং জাহাজের সমস্ত যাত্রী ডুবে মারা গিয়েছিল। তিনি (রাদিআল্লাহ আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে বেঁচে গেলেন? সে বললো, আমার হাতের কাছে জাহাজের একটি তক্তা ভেসে এসেছিল। আমি সেটার সাহায্যে সাঁতরিয়ে কূলের প্রায় কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম। কিন্তু পানির স্রোতে সেই তক্তাটা হাতছাড়া হয়ে যায়। তখন নিজেই চেষ্টা করতে লাগলাম, হাত পা নড়াছড়া করে কোন মতে কিনারে এসে পৌছলাম। হযরত জাফর ছাদেক ফরমালেন, এবার আমার কথা শুনেনঃ

যখন আপনি জাহাজে ছিলেন, তখন আপনার জাহাজের উপর এ বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যে, এ জাহাজ আপনাকে কূলে পৌছাবে। যখন সেটা ডুবে গেল তখন আপনার আস্থা ও ভরসা তক্তার উপর ছিল, যা হঠৎ আপনার হাতে লেগেছিল। কিন্তু যখন সেটাও আপনার হাতছাড়া হয়ে গেল, তখন সেই অসহায় অবস্থায় আপনার কি এ রকম আশা

ছিল যে, কেউ বাঁচাতে চাইলে আমি বাঁচতে পারি? সে বললো এ আশাতো নিশ্চয় ছিল। হযরত জাফর ছাদেক ফরমালেন, কার কাছে এ আশা ছিল? কে বাঁচাতে পারে? এ প্রশ্নে সেই নাস্তিক নিশ্চুপ হয়ে গেল। তিনি ফরমালেন, ভালমতে স্মরণ রাখুন, সেই অসহায় অবস্থায় আপনি যে সত্ত্বার কাছে আশাবাদী ছিলেন, সেই হলো খোদা, সেই তোমাকে বাঁচিয়েছে। নাবিক এ কথা শুনে মোহমুক্ত হলো এবং ইসলাম গ্রহণ করলো। (তফসীরে কবীর ২২১ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ খোদা একজন নিশ্চয় আছে। বিপদের সময় অনায়াসে খোদার দিকে খেয়াল যায়। খোদার অস্তিত্বের স্বীকার স্বভাবগত বিষয়।

কাহিনী নং-৩

এক বুদ্ধিমতী বৃদ্ধা

এক মাওলানা এক বৃদ্ধাকে ছরকায় সূতা কাটতে দেখে বললেন, বুড়ি, সারা জীবন কি শুধু ছরকা ঘুরাতে রইলে, নাকি খোদাকেও জানার জন্য কিছু করলে? বৃদ্ধা উত্তর দিল, বেটা, এ ছরকার মধ্যে আমি খোদাকে জানতে পেরেছি। মাওলানা সাহেব বললেন, কি আশ্চর্য! তাহলে বলেন দেখি, আল্লাহ মওজুদ আছে কিনা? বুড়ি বললো, প্রতিটি মুহূর্তে, রাতদিন সব সময় আল্লাহ মওজুদ আছেন। মাওলানা সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিভাবে? সে বললো, এভাবে, যেমন যতক্ষন পর্যন্ত আমি এ ছরকাকে চালাতে থাকি, ততক্ষণ এটা চলতে থাকে এবং যখন আমি এটাকে ছেড়ে দি, তখন এটা সে অবস্থায় থেমে যায়। তাই যদি এ ছোট ছরকায় সব সময় চালকের প্রয়োজন হয়, তাহলে জমীন, আসমান , চাঁদ, সূর্যের মত বিশাল ছরকাগুলোর চালকের প্রয়োজন কিভাবে না হতে পারে। অতএব যেভাবে আমার কাঠের ছরকার একজন চালকের প্রয়োজন, সে রকম আসমান-জমীনের মত বিশাল ছরকারও চালকের প্রয়োজন। যতক্ষণ পর্যন্ত সে চালাতে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সব ছরকা চলতে থাকবে এবং যখন যে ছেড়ে দেবে, তখন থেমে যাবে। কিন্তু আমি কোন সময় জমীন-আসমান, চাঁদ, সূর্যকে থেমে থাকতে দেখিনি । এতে প্রমাণিত হয় যে, এগুলোর চালক সব সময় মওজুদ আছেন।

মাওলানা সাহেব পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা বলুন দেখি, আসমান জমীনের চালক একজন, কি দু'জন? বুড়ি জবাব দিল, একজন এবং এর প্রমাণও আমার এ ছরকা। কেননা, যখন আমি এ ছরকাকে আমার মর্জি মুতাবেক যেদিকে চালনা করি, তখন এ ছরকা আমারই মর্জিমত সেদিকে চলে। যদি অন্য আর একজন চালক হতো, তাহলে

সে হয়তো আমার সাহায্যকারী হয়ে আমার মর্জি মুতাবিক চালাতো। তখন ছরকার গতি বৃদ্ধি পেয়ে স্বাভাবিক গতির মধ্যে তারতম্য সৃষ্টি হয়ে উৎপাদনে ব্যাঘাত হতো আর যদি সে আমার মর্জির বিপরীত এবং আমার চালনার উল্টো দিকে চালাতো, তাহলে এ ছরকা হয়তো থেমে যেত অথবা ভেঙ্গে যেত। কিন্তু এ রকম হয়নি। কেননা আমি ছাড়া অন্য কেউ এটা চালায় নাই। অনুরূপ আসমান-জমীনের যদি দ্বিতীয় আর একজন চালক হতো, তাহলে নিশ্চয় আসমানী ছরকার গতি বৃদ্ধি পেয়ে রাত দিনের গতিবিধির মধ্যে তারতম্য এসে যেতো বা থেমে যেত বা ভেঙ্গে যেত। যখন এরকম হয়নি, তাহলে নিশ্চয়ই মনে করতে হবে আসমান জমীনের ছরকা চালক একজনই। (সীরাতুছছালেহীন ৩পৃঃ)।

সবক ঃ দুনিয়ার প্রতিটি জিনিস স্বীয় সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব ও একত্বের সাক্ষী। কিন্তু এটা উপলব্ধি করার জন্য সুষ্ঠু জ্ঞানের প্রয়োজন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ছিয়্যেদুল আম্বিয়া হুযুর আহমদ মুজতবা মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

কাহিনী নং-৪

হযরত জিব্রাইল আমীন ও এক নুরানী তারকা।

একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত জিব্রাইল আমীনকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিব্রাইল তোমার বয়স কত? হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আরয করলেন, আমার সঠিক জানা নেই, তবে এতটুকু জানি যে চতুর্থ হেজাবে এক নুরানী তারকা সত্তর হাজার বছর পর পর চমকাতো। আমি সেটাকে বাহাত্তর হাজার বার চমকাতে দেখেছি। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এটা শুনে ফরমালেন

وَعِـزَّةِ رَبِّى اَنَا ذَالِكَ الْكَوْكَبُ আমার প্রতিপালকের ইজ্জতের কসম! আমিই সেই নুরানী তারকা। (রুহুল বয়ান ৯৪৭ পৃঃ ১ম জিলদ)।

সবক ঃ আমাদের হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সৃষ্টি কুলের সবের আগে সৃষ্টি

হয়েছেন এবং তাঁর পবিত্র নূর ঐ সময়ও ছিল যখন না ছিল কোন ফিরিশতা, কোন মানুষ, না ছিল জমীন আসমান বা অন্য কোন বস্তু।

কাহিনী নং- ৫

ইয়ামনের বাদশাহ

কিতাবুল মুসততরফ, হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ও তারিখে ইবনে আসাকেরে বর্ণিত আছে যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর পৃথিবীতে আবির্ভাবের এক হাজার বছর আগে ইয়ামনের বাদশাহ ছিলেন তুব্বে আউয়াল হোমাইরী। তিনি একবার স্বীয় রাজ্য পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। তাঁর সাথে ছিল বার হাজার আলেম ও হেকিম, এক লক্ষ বত্রিশ হাজার অশ্বারোহী এবং এক লক্ষ তের হাজার পদাতিক সিপাই।এমন শান-শওকতে বের হয়ে ছিলেন যে যেখানেই গেছেন, এ দৃশ্য দেখার জন্য চারিদিক থেকে লোক এসে জমায়েত হয়ে যেত। ভ্রমন করতে করতে যখন মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌছলেন, তখন তাঁর এ বিশাল বাহিনীকে দেখার জন্য মক্কাবাসীর কেউ আসলেন না। বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং উজীরে আযমকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উজীর ওনাকে জানালেন, এ শহরে এমন একটি ঘর আছে যাকে বায়তুল্লাহ বলা হয়। এ ঘর ও এ ঘরের খাদেমগণ ও এখানকার বাসিন্দাগণকে পৃথিবীর সমস্ত লোক সীমাহীন সম্মান করে। আপনার বাহিনী থেকে অনেক বেশী লোক নিকটবর্তী ও দূর-দূরান্ত থেকে এ ঘর জিয়ারত করতে আসে এবং এখানকার বাসিন্দাগণের সাধ্যমত খেদমত করে চলে যায়। তাই আপনার বাহিনীর প্রতি ওনাদের কোন আকর্ষণ নেই। এটা শুনে বাদশার রাগ আসলো এবং কসম করে বললেন, আমি এ ঘরকে ধূলিস্যাৎ করবো এবং এখানকার বাসিন্দাগণকে হত্যা করবো। এটা বলার সাথে সাথে বাদশাহর নাক মুখ ও চোখ থেকে রক্ত ঝরতে লাগলো এবং এমন দুর্গন্ধময় পূঁজ বের হতে লাগলো যে ওর পাশে বসার কারো সাধ্য রইলো না। এ রোগের নানা চিকিৎসা করা হলো কিন্তু কোন কাজ হলো না। সন্ধ্যায় বাদশাহর সফর সঙ্গী ওলামায়ে কিরামের একজন আলেমে রব্বানী নাড়ী দেখে বললেন, রোগ হচ্ছে আসমানী কিন্তু চিকিৎসা হচ্ছে দুনিয়াবী। হে বাদশাহ মহোদয়, আপনি যদি কোন খারাপ নিয়ত করে থাকেন, তাহলে অনতিবিলম্বে সেটা থেকে তওবা করুন। বাদশাহ মনে মনে বায়তুল্লাহ শরীফ ও এর খাদেমগণ সম্পর্কিত স্বীয় ধারণা থেকে তওবা করলেন এবং তওবার সাথে সাথে রক্ত ঝরা ও পূঁজ পড়া বন্ধ হয়ে গেল। আরোগ্যের খুশীতে বাদশাহ বায়তুল্লাহ শরীফে রেশমী গিলাফ চড়ালেন

এবং শহরের প্রত্যেক বাসিন্দাকে সাতটি সোনার মুদ্রা ও সাত জোড়া রেশমী কাপড় নজরানা দিলেন।

অতঃপর এখান থেকে মদীনা মনোয়ারা গেলেন, সফর সঙ্গী ওলামায়ে কিরামের মধ্যে যারা আসামানী কিতাব সমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞ ছিলেন, তাঁরা সেখানকার মাঠি শুঁকে ও পাথর পরীক্ষা করে দেখলেন যে শেষ নবীর হিজরতের স্থানের যেসব আলামত তাঁরা পড়েছিলেন এ জায়গার সাথে এর মিল দেখলেন, তখন তাঁরা সংকল্প করলেন, আমরা এখানে মৃত্যু বরণ করবো এবং এ জায়গা ত্যাগ করে কোথাও যাব না। আমাদের কিসমত যদি ভাল হয়, তাহলে কোন এক সময় শেষ নবী তশরীফ আনলে আমরাও সাক্ষাত করার সৌভাগ্য লাভ করবো। অন্যথায় কোন এক সময় তাঁর পবিত্র জুতার ধূলি উড়ে আমাদের কবরের উপর নিশ্চয় পতিত হবে, যা আমাদের নাজাতের জন্য যথেষ্ট।

এটা শুনে বাদশাহ ওসব আলেমগণের জন্য চারশ ঘর তৈরী করালেন এবং সেই বড় আলেমে রব্বানীর ঘরের কাছে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর উদ্দেশ্যে দোতলা বিশিষ্ট একটি উন্নত ঘর তৈরী করালেন এবং অছিয়ত করলেন যে যখন তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তশরীফ আনবেন, তখন এ ঘর যেন তাঁর আরামগাহ হয়। ঐ চারশ আলেমগনকে যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য করলেন এবং বললেন আপনারা এখানে স্থায়ীভাবে থাকুন। অতঃপর সেই বড় আলেমে রব্বানীকে একটি চিঠি লিখে দিলেন এবং বললেন, আমার এ চিঠি শেষনবীর খেদমতে পেশ করবেন। যদি আপনার জিন্দেগীতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর আর্বিভাব না ঘটে, তাহলে আপনার বংশধরকে অছিয়ত করে যাবেন, যেন আমার এ চিঠিখানা বংশানুক্রমে হেফাজত করা হয়, যাতে শেষ পর্যন্ত শেষ নবীর খেদমতে পেশ করা যায়। এরপর বাদশাহ দেশে ফিরে গেলেন।

এ চিঠি এক হাজার বছর পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর খেদমতে পেশ করা হয়েছিল। কিভাবে পেশ করা হয়েছিল এবং চিঠিতে কি লিখা ছিল, তা শুনুন এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এর শানমানের বাস্তব নির্দশন অবলোকন করুন। চিঠির বিষয়বস্তু ছিল ঃ

"অধম বান্দা তুবেব আউয়াল হোমাইরীর পক্ষ থেকে শফীয়ুল মুযনাবীন সৈয়্যদুল মুরসালীন মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি।

হে আল্লাহর হবীব, আমি আপনার উপর ঈমান আনতেছি এবং আপনার প্রতি যে কিতাব

নাযিল হবে, সেটার উপরও ঈমান আনতেছি। আমি আপনার ধর্মের উপর আস্থাশীল। অতএব যদি আমার আপনার সাথে সাক্ষাতের সুযোগ হয়, তাহলে খুবই ভাল ও সৌভাগ্যের বিষয় হবে। আর যদি আপনার সাক্ষাত নছিব না হয়, তাহলে আমার জন্য মেহেরবাণী করে শাফায়াত করবেন এবং কিয়ামত দিবসে আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি আপনার প্রথম উম্মত এবং আপনার আর্বিভাবের আগেই আপনার বায়াত করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ এক এবং আপনি তাঁর সত্যিকার রসূল।"

ইয়ামনের বাদশাহর এ চিঠি বংশানুক্রমে সেই চারশ ওলামায়ে কিরামের পরিবারের মধ্যে প্রাণের চেয়ে অধিক যত্ন সহকারে রক্ষিত হয়ে আসছিল। এভাবে এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। ওসব ওলামায়ে কিরামের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা বেড়ে মদীনার অধিবাসী কয়েকগুন বৃদ্ধি পেল। এ চিঠি ও অছিয়ত নামাও সেই বড় আলেমে রব্বানীর বংশধরের মধ্যে হাত বদল হতে হতে হযরত আবু আয়ুব আনছারী (রাদি আল্লাহ আনহু) এর হাতে এসে পৌঁছে। তিনি এটা তাঁর বিশিষ্ট গোলাম আবু লাইলার হেফাজতে রাখেন। যখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মক্কা মুয়াজ্জামা থেকে হিজরত করে মদীনা মনোয়ারার প্রান্তসীমায় পর্দাপন করেন, সুনিয়াতের ঘাটিসমূহ থেকে তাঁর উষ্ট্রী দৃষ্টি গোচর হলো, তখন মদীনার সৌভাগ্যবান লোকেরা মাহবুবে খোদার অভ্যর্থনার জন্য নারায়ে রেসালতের শ্লোগান দিয়ে দলে দলে এগিয়ে গেলেন, অনেকে ঘরবাড়ী সাজানো ও রাস্তা ঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়োজিত হলেন, অনেকে দাওয়াতের আয়োজন করতে লাগলেন, সবাই এটাই অনুময়-বিনয় করছিলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমার ঘরে তশরীফ রাখুক। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, আমার উষ্ট্রীর লাগাম ছেড়ে দাও। যে ঘরের সামনে গিয়ে এটা দাঁড়াবে এবং বসে যাবে, সেটাই হবে আমার অবস্থানের জায়গা। উল্লেখ্য যে, ইয়ামনের বাদশাহ তুবেব আউয়াল হোমাইরী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর জন্য দোতলা বিশিষ্ট যে ঘর তৈরী করে ছিলেন, সেটা তখন হযরত আবু আয়ুব আনছারীর অধীনে ছিল। উষ্ট্রী সেই ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। লোকেরা আবু লাইলাকে গিয়ে বললেন, ইয়ামনের বাদশাহর সেই চিঠিখানা হুযুরকে দিয়ে এসো। সে যখন হুযুরের সামনে হাজির হলো, হুযুর ওকে দেখে ফরমালেন তুমি আবু লাইলা? এটা শুনে আবু লাইলা আশ্চর্য হয়ে গেল। পুনরায় ফরমালেন, আমি মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ, ইয়ামনের বাদশার সেই চিঠিটা যেটা তোমার হেফাযতে আছে, সেটা আমাকে দাও। অতঃপর আবু লাইলা সেই চিঠি হুযুরকে দিলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) চিঠি পাঠ করে ফরমালেন, নেক বান্দা তুবেব আউয়ালকে অশেষ মুবারকবাদ। (মিজানুল আদিয়ান)।

সবক ঃ সর্বকালে আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর গুণকীর্তন হয়েছে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিরা হুযুর থেকে ফয়েজ লাভ করেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আগে পরের সব বিষয় জানেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর আর্বিভাবের আনন্দে ঘর-বাড়ী সজ্জিত করা সাহবায়ে কিরামের সুন্নাত। আজ যারা হুযুরের আবির্ভাবের আনন্দে ঘরবাড়ী হাট-বাজার সজ্জিত করা ও আনন্দ মিছিল বের করাকে বেদআত বলে, তারা নিজেরাই বড় বিদাতী।

কাহিনী নং- ৬

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর স্বপ্ন

হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) ইসলাম গ্রহণের আগে অনেক বড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি তখন ব্যবসায়িক ব্যাপারে একবার সিরিয়া গিয়েছিলেন। তথায় একরাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, আসমান থেকে চাঁদ সূর্য অবতীর্ণ হয়ে তাঁর কোলের উপর এসে পড়ে। তিনি স্বীয় হাতে চাঁদ, সূর্যকে ধরে বুকে লাগালেন এবং নিজের চাদরে জড়িয়ে নিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি এক ঈসায়ী পাদরীর কাছে গেলেন এবং ওর কাছে সেই স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞেস করলেন। পাদরী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে? তিনি বললেন, আমার নাম আবু বকর, আমি মক্কার অধিবাসী। পাদরী জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোন্ গোত্রের লোক? বললেন, বনু হাশেমের। জিজ্ঞেস করলেন, জীবিকার উৎস কি? উত্তর দিলেন, ব্যবসা। এবার পাদরী বললেন, মনোযোগসহকারে শুনুন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তশরীফ এনেছেন। তিনিও সেই বনী হাশেম গোত্রের অন্তর্ভূক্ত, তিনিই শেষ নবী। যদি তিনি না হতেন, আল্লাহ তাআলা জমীন আসমান কিছুই সৃষ্টি করতেন না। অন্য কোন নবীও সৃষ্টি করতেন না। তিনি সকল নবীর সরদার। হে আবু বকর! আপনি তাঁর ধর্মে শামিল হয়ে যাবেন, তাঁর উজীর হবেন এবং তাঁর পরে তাঁর খলিফা মনোনিত হবেন। এটাই আপনার স্বপ্নের তাবীর। এটাও জেনে নিন যে আমি এ মহান নবীর প্রশংসা ও গুনকীর্তন তাওরাত ও ইনজিল কিতাবে পড়েছি, আমি তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং মুসলমান হয়েছি। কিন্তু ঈসায়ীদের ভয়ে স্বীয় ঈমান প্রকাশ করিনি। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন তাঁর স্বপ্নের এ তাবীর শুনলেন,

তখন মনের মধ্যে ইশকে রসূলের জজ্বা সৃষ্টি হলো, কাল বিলম্ব না করে মক্কায় ফিরে আসলেন এবং হুযুরের সন্ধান নিয়ে হুযুরের দরবারে হাজির হলেন এবং হুযুরকে দেখে চক্ষু জুড়ালেন। হুযুর ফরমালেন আবু বকর, তুমি এসে গেছ? আর দেরী কর না। তাড়াতাড়ি সত্য ধর্মে দাখিল হয়ে যাও। ছিদ্দিকে আকবর বললেন, খুবই ভাল কথা হুযুর। তবে কোন একটা মুজিজা দেখালে খুশি হতাম। হুযুর ফরমালেন, যে স্বপ্ন তুমি সিরিয়ায় দেখে এসেছ এবং পাদরীর মুখ থেকে যে তাবীব শুনে এসেছ, সেটাইতো আমার মুজিজা। ছিদ্দিকে আকবর এটা শুনে আরয করলেন,

صَدَقْتَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَا اَشْهَدُ اَنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ

অর্থাৎ হে আল্লাহর রসুল আপনি সত্য বলেছেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি বাস্তবিকই আল্লাহর সত্যিকার রসুল। (জামেউল মুজিজাত ৪ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উজীর ও বরহক খলিফা। আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কোন কথা গোপন থাকে না। তিনি অদৃশ্য জ্ঞানী। এটাও জানা গেল যে, সমস্ত সৃষ্টিকুল আমাদের হুযুরের বদৌলতে সৃষ্টি করা হয়েছে। হুযুর না হলে কিছুই হতো না। এক উর্দূ কবি সুন্দর বলেছেন ঃ

وہ نہ تھے توکچھ نہ تھا– وہ جونہ ہوں توکچھ نہ ہو۔

جان ہیں وہ جہان کی– جان ہے تو جہان ہے۔

অর্থাৎ তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) না হলে কিছুই হতো না। তিনি জগতের প্রাণ। প্রাণ আছে বলেই জগত বহাল আছে।

কাহিনী নং- ৭

ইবলিসের পৌত্র

বায়হাকী শরীফে আমীরুল মুমেনীন হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন আমরা হুযুরের সাথে তাহামার একটি পাহাড়ের উপর বসেছিলাম। হঠাৎ এক বৃদ্ধ লাঠির উপর ভর দিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ সামনে হাজির হলো এবং সালাম পেশ করলো। হুযুর সালামের জবাব দিলেন এবং ফরমালেন ওর আওয়াজটা জ্বীনের আওয়াজের মত মনে হচ্ছে। পুনরায় হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে আরয

করলো, হুযুর আমি জ্বীন। আমার নাম হামা, হীমের ছেলে, হীম হলো লাকীসের ছেলে এবং লাকীস হচ্ছে ইবলিসের ছেলে। হুযুর ফরমালেন, তাহলে তো তোমার ও ইবলিসের মধ্যে মাত্র দু প্রজন্মের ব্যবধান। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বয়স কত? সে বললো, ইয়া রাসুলল্লাহ, পৃথিবীর যতটুকু বয়স, আমারও বয়স ততটুকু হবে। তবে কিছু কম হতে পারে। যেদিন কাবিল হাবিলকে হত্যা করেছিল সেই সময় আমি কয়েক বছরের শিশু ছিলাম। তবে কথাবার্তা বুঝতাম। পাহাড়ে দৌড়াদৌড়ি করতাম। মানুষের খাদ্য শস্য চুরি করে নিয়ে আসতাম। মানুষের মনে কুমন্ত্রনাও দিতাম, যাতে ওরা আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে অসদ্বাচরণ করে।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, তাহলে তো তুমি খুবই খারাপ। সে আরয করলো, হুযুর আমাকে ভৎসনা করবেন না। আমি আপনার সমীপে তওবা করতে এসেছি। ইয়া রাসুলল্লাহ, আমি হযরত নূহ আলাইহিস সালামের সাথে সাক্ষাৎ করেছি এবং এক বছর তাঁর সাথে মসজিদে অবস্থান করেছি। আমি তাঁর বারগাহেও তওবা করেছি। হযরত হুদ, হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সংশ্রবেও ছিলাম এবং তাঁদের থেকে তাওরাত শিখেছি এবং ওনাদের সালাম হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে পৌঁছায়েছি। হে নবীগণের সরদার! হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বলেছিলেন, 'যদি তোমার সাথে মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সাক্ষাৎ হয়, তাহলে আমার সালাম ওনাকে পৌঁছাইও'।তাই হুযুর এখন আমি সেই আমানত থেকে দায়মুক্ত হওয়ার জন্য আপনার সমীপে হাজির হয়েছি। এটাও আশা আছে যে আপনার পবিত্র জবানে আমাকে কিছু আল্লাহের কালাম শিক্ষা দিবেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওকে সূরা মুরসেলাত, সূরা আম্মা ইতাসাআলুন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাছ এবং ইজাশাশামস শিক্ষা দিলেন। আরও ফরমালেন, হে হামা যখন তোমার কোন প্রয়োজন হয়, আমার কাছে আসিও এবং আমার সংশ্রব ত্যাগ করিও না।

হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, হুযুর আলাইহিস সালাম তো বেছাল ফরমালেন কিন্তু হামা সম্পর্কে কিছু বলে যান নি। আল্লাহ্ জানেন, হামা কি এখনও জীবিত আছে, নাকি মারা গেছে। (খোলাছাতুত তাফাসীর ১৭০ পৃঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মানব, জ্বীন, সকলের রসূল। তাঁর দরবার জ্বীন ও ইনসান সকলের জন্য উম্মুক্ত।

পবিত্র হত্যাকারী

মক্কা মুয়াজ্জমায় অলিদ নামে এক কাফির বাস করতো। ওর একটি সোনার মূর্তি ছিল। সেটার সে পূজা করতো। একদিন সেই মূর্তির মধ্যে নড়াচাড়া লক্ষ্য করা গেল এবং সেই মূর্তি বলতে লাগলো, হে মানবগণ, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল নয়। ওকে কখনও বিশ্বাস কর না (মায়াজাল্লা)। অলিদ দারুন খুশী হলো, বাইরে গিয়ে বন্ধু বান্ধবদেরকে বললো, সুসংবাদ, আজ আমার মাবুদ কথা বলেছে। সুস্পষ্টভাবে বলেছে যে মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল নয়। এটা শুনে লোকেরা ওর ঘরে এসে দেখলো যে বাস্তবিকই মূর্তি একথাটা বার বার বলতেছে যে, মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল নয়। ওরাও দারুন খুশী হলো। পরের দিন ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে অলিদের ঘরে বিরাট জমায়েতের ব্যবস্থা করা হলো যাতে সবাই মূর্তির মুখ থেকে সেকথাটা শুনতে পায়। লোকেরা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কেও আমন্ত্রণ জানালো যেন হুযুরও এসে মূর্তির মুখে সেই কথাটা শুনেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন তশরীফ নিয়ে গেলেন তখন সেই মূর্তি বলে উঠলো; হে মক্কাবাসী, ভাল মতে জেনে নাও, মুহাম্মদ আল্লাহর সত্যিকার রসূল। তাঁর প্রতিটি বাণী সত্য। তাঁর ধর্ম বরহক। তোমরা এবং তোমাদের মূর্তি মিথ্যা, পথ ভ্রষ্ট এবং পথ ভ্রষ্টকারী। তোমরা যদি এ সত্যিকার রসূলের প্রতি ঈমান না আন, তাহলে জাহান্নামে যাবে। অতএব বুদ্ধি মত্তার সাথে কাজ কর এবং এ সত্যিকার রসূলের গোলামী গ্রহণ কর।"

মূর্তির এ বক্তব্য শুনে অলিদ ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেল এবং স্বীয় মাবুদকে হাতে নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে টুকরা টুকরা করে ফেললো।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিজয়ী বেশে ওখান থেকে রওয়ানা হলেন। পথে সবুজ পোষাকধারী এক অশ্বারোহী হুযুরের সাথে সাক্ষাৎ করলেন, ওর হাতে একটি তলোয়ার ছিল, যার থেকে রক্ত পড়ছিল। হুযুর জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, হুযুর, আমি জ্বীন এবং আপনার একজন নগণ্য গোলাম ও মুসলমান। আমি তুর পাহাড়ে থাকি। আমার নাম মহিন ইবনুল আবর। আমি কিছু দিনের জন্য অন্যত্র গিয়ে ছিলাম। আজই ঘরে ফিরে এসেছি। ঘরে এসে দেখি আমার পরিবারের সদস্যরা কাঁদতেছে। এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে এক কাফির জ্বীন যার নাম মুসাফফর সে মক্কা গিয়ে অলিদের মূর্তির মধ্যে প্রবেশ করে হুযুরের বিরুদ্ধে যা-তা বলে এসেছে।

আজও রওয়ানা হয়েছিল আপনার সম্পর্কে যা-তা বলার জন্য। ইয়া রসুলল্লাহ এটা শুনে আমর ভীষন রাগ আসলো। তাই তলোয়ার নিয়ে ওর পিছে ছুটলাম এবং রাস্তায় তাকে হত্যা করে ফেলেছি। অতপর আমি নিজেই অলিদের মূর্তির ভিতরে প্রবেশ করে আজ-কের এ বক্তব্য রাখলাম, ইয়া রসূলল্লাহ।

হুযুর এ ঘটনা শুনে খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন এবং তাঁর এ আনুগত্য জ্বীনের জন্য দুআ করলেন। (জামেউল মুজিজাত-৮ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জ্বীনদের রসূল এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র শান মানের বিপরীত কোন কিছু শুনানোর জন্য সমাবেশ করা অলিদের মত কাফিরের সুন্নাত।

কাহিনী নং- ৯

তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা চিকিৎসাকারী

ইয়ুশানূয়া গোত্রের জামাদ নামক এক ব্যক্তি তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা মানুষের উপর জ্বীন-ভূত ইত্যাদির আছরের চিকিৎসা করতো। একবার সে মক্কা মুয়াজ্জামায় গিয়েছিল। তখন কতেক লোককে এটা বলতে শুন্‌লো যে মুহাম্মদের উপর জ্বীনের আছর হয়েছে বা পাগল হয়ে গেছে (মায়াজাল্লা)। জামাদ বললো, আমি তন্ত্র মন্ত্র দ্বারা এ রকম রোগের চিকিৎসা করে থাকি। আমাকে দেখাও, সে এখন কোথায়? ওরা ওকে হুযুরের কাছে নিয়ে গেল। জামাদ যখন হুযুরের কাছে গিয়ে বসলো, তখন হুযুর ফরমালেন, জামাদ, তোমার তন্ত্র মন্ত্র পরে শুনাও, প্রথমে আমার কথা শুন, অতপর তিনি তাঁর পবিত্র মুখে এ খুৎবাটি পড়তে শুরু করলেন ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا مِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ. وَاَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, তাঁরই প্রশংসা করছি। তাঁরই সাহায্য কামনা করছি এবং তাঁরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি। আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি নফসের কুমন্ত্রনা থেকে এবং মন্দ আমল থেকে।

আল্লাহ যাকে হিদায়েত করে তাকে কেউ গুমরাহ করতে পারে না আর যাকে গুমরাহ করে, তাকে কেউ হিদায়েত করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই আরও সাক্ষী দিচ্ছি মুহাম্মদ তাঁরই বান্দাও রসূল।

জামাদ এ খুৎবা শুনে বিভোর হয়ে গেল এবং আরয করতে লাগলো, হুযুর! পুনরায় আর একবার পড়ুন। হুযুর পুনরায় সেই খুৎবা পাঠ করলেন। এবার জামদ (যে জ্বীনের আছর তাড়াতে এসেছিল, তার উপর থেকে কুফরীর আছর কিভাবে দূরীভূত হলো, দেখুন) আর স্থির থাকতে পারলো না। বলে উঠলো, খোদার কসম, আমি অনেক যাদুকর জ্যোতিষী ও কবিদের কথা শুনেছি। কিন্তু আপনার থেকে যা শুনেছি, এটাতো অর্থের দিক দিকে এক বিশাল সমুদ্র। আপনার পবিত্র হাত বাড়িয়ে দিন, আমি আপনার হাতে বায়াত হচ্ছি। এ বলে সে মুসলমান হয়ে গেল এবং যারা ওকে হুযূরের চিকিৎসার জন্য নিয়ে এসেছিল, তারা আশ্চর্য ও নিরাশ হয়ে ফিরে গেল (মুসলিম ৩২০পৃঃ ১ম জিঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র মুখে এমন তাছির ছিল যে, বড় বড় পাষাণ হৃদয়ও গলে মোম হয়ে যেত। আমাদের হুযুরকে যারা যাদুকর ও পাগল বলতো, বাস্তবে ওরাই পাগল ছিল। অনুরূপ আজও যারা হুযুরের জ্ঞান ও ক্ষমতা এবং নূরের অস্বীকার করে, তারাও মূলতঃ নিজেরাই মূর্খ, কুটিল মনা ও মলিন চেহারাধারী।

কাহিনী নং -১০

রোকানা পলোয়ান

বনী হাশেম গোত্রে রোকানা নামে এক মুশরিক পলোয়ান ছিল। সে খুব শক্তিশালী ও সাহসী ছিল। ওকে কেউ পরাভূত করতে পারেনি। সে ইজম নামে এক জংগলে থাকতো, ওখানে ছাগল চড়াতো এবং খুবই সম্পদশালী ছিল। একদিন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একাকী সেই জংগল দিয়ে যাচ্ছিল। রোকানা তাঁকে দেখে সামনে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! তুমিতো সেই ব্যক্তি, যে আমাদের দেবতা লাত ও উজ্জার কুৎসা রটনা ও ঘৃনা কর এবং স্বীয় এক খোদার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা কর। তোমার প্রতি যদি আমার সহানুভূতি না থাকতো, তাহলে আজ আমি তোমাকে মেরে ফেলতাম। যাক আমার সাথে কুস্তি লড়তে এসো, তুমি তোমার খোদাকে ডাক আর আমি আমার লাত ও উজ্জাকে ডাকতেছি। দেখি, তোমার খোদার কাছে কত শক্তি আছে। হুযুর

ফরমালেন, তুমি যদি সত্যি কুস্তি লড়তে চাও, তাহেল চল, আমি প্রস্তুত আছি। রোকানা এ জবাব শুনে প্রথমে হতভম্ব হয়ে গেল। পরে ভীষণ অহংকারের সাথে কুস্তি লড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেল।

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রথম ধাক্কায় ওকে ফেলে দিলেন এবং ওর বুকের উপর বসে গেলেন। রোকানা জীবনে এই প্রথমবার ধরাশায়ী হয়ে বড় লজ্জিত ও আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল। সে বললো, হে মুহাম্মদ! আমার বুক থেকে উঠে যাও। আমার লাত ও উজ্জা আমার দিকে খেয়াল করেনি। আর একবার কুস্তি লড়ার সুযোগ দাও। হুযুর ওর বুক থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলেন। রোকানাও দ্বিতীয়বার কুস্তির জন্য দাঁড়ালো। এবারও রোকানাকে চোখের পলকে ফেলে দিলেন। রোকানা বললো, হে মুহাম্মদ! মনে হয় আজ আমার লাত ও উজ্জা আমার উপর নারাজ। তোমার খোদা তোমাকে সাহায্য করতেছে। যাক চল, আর একবার লড়ে দেখি। এবার লাত ও উজ্জা নিশ্চয় আমাকে সাহায্য করবে। হুযূর তৃতীয় বারও কুস্তি লড়ায় জন্য রাজি হয়ে গেলেন এবং তৃতীয় বারও ওকে পরাভূত করলেন। এবার রোকানা বড় লজ্জিত হলো এবং বললো, হে মুহাম্মদ! আমার ছাগলগুলোর মধ্যে থেকে যতটি চাও নিয়ে যাও। হুযূর ফরমালেন রোকানা আমার তোমার সম্পদের প্রয়োজন নেই। তবে মুসলমান হয়ে যাও,যাতে জাহান্নাম থেকে বাঁচতে পার। সে বললো, হে মুহাম্মদ! মুসলমানতো হয়ে যেতে পারি কিন্ত মনে সঙ্কোচবোধ হচ্ছে মদীনা ও এর পাশ্ববর্তী এলাকার মহিলারা ও শিশুরা বলবে যে এত বড় পলোয়ান পরাজিত হলো এবং মুসলামান হয়ে গেল। তোমার সম্পদ নিয়ে তুমি থাক, এ বলে হুযূর ফিরে চলে আসলেন। এদিকে হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) তাঁর তালাশে বের হলেন এবং হুযূর ইজমের জংগলের দিকে তশরীফ নিয়ে যাওয়ার কথা শুনে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কেননা ওদিকে রোকানা পলোয়ান থাকে, হয়তো হুযূরকে কষ্ট দিতে পারে। যাক হুযূরকে ফিরে আসতে দেখে উভয়ে হুযূরের খেদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনি ওদিকে কেন গেলেন, আপনি কি জানেন না যে ওদিকে ইসলামের পরম শত্রু রোকানা থাকে? হুযূর এটা শুনে মুচকি হেসে বললেন, যখন আমার আল্লাহ সব সময় আমার সাথে আছে, তখন রোকানাকে ভয় করার কি আছে? রোকানার বাহাদুরীর কাহিনী শুন-এ বলে তিনি সমস্ত কাহিনী শুনালেন। হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর ফারুক এ ঘটনা শুনে খুবই খুশী হলেন এবং আরয করলেন, হুযূর সে এমন পলোয়ান ছিল যে আজ পর্যন্ত ওকে কেউ ফেলতে পারেনি। ওকে ফেলাটা একমাত্র আল্লাহর রসূলের কাজ।

(আবু দাউদ ২০ পৃঃ ২ জিঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক ফযীলত ও কামালিয়াতের ভাণ্ডার। দুনিয়ার কোন শক্তি হুযূরের সামনে অটল থাকতে পারে না। বিরোধীতাকারীরাও হুযূরের ফযীলত ও কামালিয়াত সম্পর্কে জ্ঞাত কিন্তু দুনিয়াবী লজ্জার কারণে স্বীকার করে না।

কাহিনী নং - ১১

হযরত খালিদ বিন অলিদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর টুপি

হযরত খালিদ বিন অলিদ (রাদি আল্লাহ আনহু) সায়ফুল্লাহ (আল্লাহর তলোয়ার) হিসেবে খ্যাত ছিলেন। তিনি যে কোন যুদ্ধে যাবার সময় স্বীয় টুপি নিশ্চয়ই মাথার উপর রাখতেন এবং সব সময় জয়ী হয়ে ফিরতেন। কোন সময় পরাজয়ের মুখ দেখেননি। একবার ইয়ারমুকের যুদ্ধে যখন যুদ্ধের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল, তখন তাঁর টুপিটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল। তিনি যুদ্ধ করা বাদ দিয়ে টুপি খুঁজতে লাগলেন। এদিকে শত্রুদের পক্ষ থেকে তীর পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। সৈন্যরা মৃত্যু সন্নিকটে মনে করতে লাগলো। এ অবস্থায়ও হযরত খালিদ টুপির খোঁজে মগ্ন রইলেন। সৈন্যরা ওনাকে গিয়ে বললেন, জনাব টুপির চিন্তা বাদ দিন, যুদ্ধ শুরু করুন। হযরত খালিদ ওদের কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করলেন না। তিনি তাঁর অনুসন্ধান যথারীতি চালিয়ে গেলেন। শেষ পর্যন্ত টুপি পাওয়া গেল। তিনি খুবই আনন্দিত হয়ে সবাইকে তাঁর টুপি প্রাপ্তির কথা জানালেন এবং বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! এ টুপি আমার এত প্রিয় কেন জানেন? আমি আজ পর্যন্ত যত যুদ্ধে জয়ী হয়েছি সব এ টুপিরই বদৌলতে। আমার কোন বাহাদুরী নেই, সব এ টুপিরই বরকত। এ টুপি না থাকলে আমি কিছু না। আর যদি এ টুপি আমার মাথায় থাকে তাহলে যতবড় শত্রু হোক না কেন আমার সামনে কিছুইনা। সৈন্যরা জানতে চাইলেন, এ টুপিতে এমন কি বৈশিষ্ট্য আছে? তিনি বললেন, দেখুন এখানে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর চুল মুবারক রয়েছে, যেটাকে আমি এটার সাথে সেলাই করে রেখেছি। একবার হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ওমরাহ পালন করার সময় আমি সাথে ছিলাম। ওমরার পর যখন তিনি তাঁর পবিত্র মস্তকের চুল মুবারক কাটালেন তখন এ চুল হস্তগত করার জন্য আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম সবাই ঝাপিয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যক্রমে আমি কয়েকটি চুল হস্তগত করতে পেরেছিলাম। সেই চুল মুবারককে আমি এ টুপিতে যত্নসহকারে

সেলাই করে রেখেছি। ফলে এ টুপি আমার জন্য সকল বরকত ও জয়ের উসীলা হয়ে গেল। আমি এর বদৌলতে প্রতিটি যুদ্ধের ময়দানে বিজয়ী হই। তাই আপনারাই বলুন, এ টুপি খুঁজে পাওয়া না গেলে কিভাবে আমার স্বস্থি বোধ হতো? (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৬৮৬ পৃঃ)

সবক ঃ হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সকল বরকত ও অবদানের উসীলা। তাঁর চুল মুবারক বরকত ও রহমতের সহায়ক। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর সংশ্লিষ্ট সব কিছুকে তাবারুক হিসেবে নিজেদের কাছে রাখতেন। যার কাছে তাঁর নগন্য চুল মুবারক থাকতো, আল্লাহ তাআলা ওকে সব কাজে কামিয়াব করতেন।

কাহিনী নং - ১২

চুল মুবারকের কামালিয়াত

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দু'টি পবিত্র চুল হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) পেয়ে ছিলেন। তিনি চুল দু'টি তাবারুক হিসেবে ঘরে নিয়ে এলেন এবং যথাযথ সম্মানের সাথে যত্নসহকারে ঘরের ভিতরে কোন এক জায়গায় রেখে দিলেন। কিছুক্ষণ পর ঘরের অভ্যন্তরে কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনতে পেলেন। ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখলেন, তখনও কুরআন তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনা যাচ্ছে। কিন্তু কাউকে দেখা গেল না। হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত ঘটনা আরয করলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মুছকি হেসে বললেন,

اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ يَجْتَمِعُوْنَ عَلٰى شَعْرِىْ وَيَقْرَؤُوْنَ الْقُرْاٰنَ.

অর্থাৎ এরা ফিরিশতা, আমার চুল মুবারকের কাছে সমবেত হয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেছে। (জামেউল মুজিজাত ৬২ পৃঃ)

সবক ঃ হুযুর সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি চুল মুবারক কামালিয়াতের ভাণ্ডার। তাঁর চুল মুবারক সৃষ্টি কুলের জন্য দর্শনীয় ও বরকত লাভের নিদর্শন। যেসব লোকের চুল মুন্ডায়ে নাপিতেরা নালা নর্দমায় ফেলে দেয়, ওরা যদি হুযূরের মত মানুষ বলে দাবী করে, তাহলে ওদের মত বদতমীজ আর কে হতে পারে?

কাহিনী নং - ১৩

ছাগল জীবিত হয়ে গেল

আহযাবের যুদ্ধে হযরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কে দাওয়াত করলেন এবং একটি ছাগল জবেহ করলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে নিয়ে যখন ওনার ঘরে গেলেন, তখন তিনি খাবার এনে হুযূরের সামনে রাখলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দেখলেন যে খাবারের তুলনায় মেহমানের সংখ্যা অনেক বেশী। তখন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, কয়েক জন করে এসে খানা খেয়ে যাও। এভাবে কয়েক জন করে সবাই খানা খেয়ে বের হয়ে গেলেন। হযরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, হুযুর আগ থেকে বলে দিয়েছিলেন যে কেউ যেন মাংসের হাড্ডি না ভাঙ্গে এবং এদিক সেদিক ফেলেও না দেয়। সবগুলো যেন এক জায়গায় রাখে। সবাই যখন খেয়ে নিলেন, তখন তিনি নির্দেশ দিলেন, ছোট বড় সব হাড্ডি একত্রিত করে ফেল। অতঃপর তিনি তাঁর পবিত্র হাত মুবারক ওগুলোর উপর রেখে কিছু পাঠ করলেন। হাত মুবারক তখনও হাড্ডির উপর ছিল এবং পবিত্র মুখে কিছু পড়তে ছিলেন, এ দিকে দেখা গেল হাড্ডির মধ্যে কিছু একটা পরিবর্তন হচ্ছে। দেখতে দেখতে হাড্ডিতে মাংসের শরীর গঠন হয়ে কান ঝাড়া দিয়ে সেই ছাগল দাঁড়িয়ে গেল। হুযূর ফরমালেন, জাবের, তোমার ছাগল তুমি নিয়ে যাও। (দলায়েলে নবুয়াত ২৪ পৃঃ, ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হায়াতের উৎস ও হায়াত দানকারী। তিনি মৃত প্রাণ ও মৃত শরীরকেও জীবিত করে দিয়েছেন। এরপরেও যারা (মাযাল্লা) হুযূর মরে মাটির সাথে মিশে গেছে বলে, তারা কত বড় মুর্খ ও বেদীন।

কাহিনী নং - ১৪

সাপের ডিম

বিশিষ্ট সাহাবী হযরত হাবীব বিন ফদীক (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। ঘটনাক্রমে উনার পা একটি বিষাক্ত সাপের ডিমের উপর পড়েছিল। এতে ডিমটি ফেটে যায় এবং এর বিষ ক্রিয়ায় হযরত হাবীব বিন ফদীক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর চোখ একেবারে ঘোলা হয়ে যায় এবং দৃষ্টি শক্তি লোপ পায়। এ অবস্থা দেখে ওনার পিতা খুবই হতাশ হয়ে পড়লো এবং ওনাকে নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সমস্ত ঘটনা শুনে ওনার চোখে থুথু দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ওনার চোখ পরিষ্কার হয়ে গেল এবং দৃষ্টি শক্তি ফিরে ফেলেন। ঘটনা বর্ণনাকারী বলেন, আমি স্বয়ং হযরত হাবীবকে দেখেছি। ঐ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর এবং চোখ একেবারে ঘোলাটে হয়ে গিয়েছিল কিন্তু হুযূরের থুথু মুবারকের বদৌলতে দৃষ্টি শক্তি এত প্রখর ছিল যে সুঁই এ সূতা গাঁথতে পারতেন। (দালায়েলে নবুয়াত ১৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূরকে যারা আমাদের মত মানুষ বলে, এ কাহিনী থেকে তাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। হুযূরের থুথু মুবারক দ্বারা অন্ধের চোখে দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসে আর ওদের থুথুর ব্যাপারে গাড়ী ঘোড়ায় লিখে দেয়া হয় যেখানে সেখানে থুথু ফেলিওনা, এর দ্বারা রোগ বিস্তার লাভ করে। তাহলে রোগ - আরোগ্য উভয়টা কিভাবে বরাবর হতে পারে?

কাহিনী নং-১৫

হযরত জাবেরের ঘর ও এক হাজার মেহমান

হযরত জাবের (রাদি আল্লাহু আনহু) খন্দকের যুদ্ধে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পবিত্র পেটের উপর পাথর বাঁধা দেখে ঘরে এসে বিবি সাহেবাকে বললেন, ঘরে এমন কিছু আছে যা রান্না করে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কে খাওয়াতে পারি? বিবি সাহেবা বললেন, সামান্য আটা আছে এবং ছাগলের একটা ছোট বাচ্চা আছে, সেটা জবেহ করতে পারেন। হযরত জাবের বললেন, ঠিক আছে আমি ছাগলটা জবেহ করে দিয়ে যাচ্ছি, তুমি সেটা ভালমতে রান্না কর। আমি গিয়ে হুযূরকে নিয়ে আসতেছি। বিবি সাহেবা বললেন, দেখুন সেখানে অনেক লোক আছে, আপনি হুযূরকে চুপে চুপে বলবেন যেন সাথে দশের অধিক লোক নিয়ে না আসেন। সেমতে হযরত জাবের হুযূরের খেদমতে গিয়ে কানে কানে বললেন, হুযুর আমি সামান্য খাবারের আয়োজন করেছি, আমার সাথে চলুন এবং অনধিক দশজন আপনার সাথে নিতে পারেন। কিন্তু হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) পুরো বাহিনীকে সম্বোধন করে বললেন, চল সবাই আমার সাথে চল, জাবের খাবারের আয়োজন করেছে। অতঃপর হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জাবেরের ঘরে এসে সেই সামান্য আটায় থুথু ফেললেন। অনুরূপ মাংসের ডেকসিতেও থুথু ফেললেন। এরপর নির্দেশ দিলেন, রুটি তৈরী কর এবং মাংস পাকাও। সামান্য আটা ও মাংসে থুথু মুবারকের

বদৌলতে এত বরকত হলো যে এক হাজার ব্যক্তি তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণ করলো কিন্তু রুটি ও মাংসে কোনটায় কমতি হলো না। (মিশকাত শরীফ ৫২৪ পৃঃ)

সবক ঃ এটা হুযুরের থুথু মুবারকের বরকত ছিল যে সামান্য খাবার এক হাজার জন তৃপ্তি সহকারে খাওয়ার পরও অবিকল রয়ে গেল, কোন কমতি হলো না। যারা হুযূরকে ওদের মত মানুষ মনে করে, তারা যদি তাদের নিজ ঘরের কোন ডেকসিতে থুথু ফেলে, তাহলে ওদের ঘরের বিবিরাই সেই ডেকসিকে বাইরে ফেলে দিবে। কেউ সেই ডেকসির খাবার খাবে না।

কাহিনী নং - ১৬

সুরাইতে সমুদ্র

হুদাইবিয়ার সন্ধির দিন সাহাবায়ে কিরামের পানি শেষ হয়ে গিয়েছিল। এমনকি অযু ও পান করার জন্য এক ফোঁটা পানি অবশিষ্ট ছিল না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে এক সুরাই পানি ছিল। হুযূর যখন সেই সুরাই থেকে অযু করছিলেন, তখন সবাই হুযুরের পাশে সমবেত হলেন এবং ফরিয়াদ করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! আমাদের কাছে তো এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট নেই, আমরা অযুও করতে পারছিনা এবং তৃষ্ণাও নিবারণ করতে পারছি না। আমরা তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে পড়েছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একথা শুনে স্বীয় হাত মুবারক সুরাইতে ডুবালেন। লোকেরা দেখলেন যে হুযূরের হাত মুবারকের পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে পাঁচটি ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। সবাই সেই ঝর্না সমূহ থেকে পানি সংগ্রহ করতে লাগলেন এবং প্রত্যেকে ইচ্ছা মাফিক পানি পান করলেন এবং অযু করে নিলেন। হযরত জাবেরের কাছে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে তখন কত লোক ছিল? তিনি বললেন, ঐ সময় যদি এক লক্ষ লোকও হতো, পানির কমতি হতো না । তবে আমরা ঐ সময় পনের'শ ছিলাম। (মিশকাত শরীফ ৫২২পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূরকে আল্লাহ তাআলা এ এখতিয়ার ও ক্ষমতা দান করেছেন যে তিনি সামান্য জিনিসকে অধিক করে দিতে পারেন। না থেকে হ্যাঁ, অস্তিত্বহীন থেকে অস্তিত্ববান করা আল্লাহর কাজ এবং সামান্য থেকে অধিক করা মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাজ। এটা আল্লাহর বিশেষ দান।

কাহিনী নং - ১৭

এক মরুযাত্রী কাফেলা

আরবের মরুভূমির মধ্যে দিয়ে এক বিরাট কাফেলা যাচ্ছিল, হঠাৎ ওদের পানি শেষ হয়ে যায়। সেই কাফেলায় বড়, ছোট, বৃদ্ধ, যুবক মহিলা সবাই ছিল। তৃষ্ণার তাড়নায় সবের

অবস্থা কাহিল হয়ে পড়েছিল। অনেক দূর পর্যন্ত পানির কোন নাম নিশানা ছিল না। ওদের কাছে এক ফোঁটা পানিও অবশিষ্ট ছিল না। এ অবস্থা দেখে মৃত্যু ওদের সামনে নৃত্য করতে লাগলো। কিন্তু ওদের প্রতি বিশেষ রহমত হলো।

হঠাৎ উভয় জাহানের সাহায্যকারী মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওদের সাহায্যার্থে তথায় পৌঁছে গেলেন। হুযূরকে দেখে সবার দেহে প্রাণ ফিরে আসলো। সবাই হুযূরের চারিদিকে সমবেত হয়ে গেল। হুযূর ওদেরকে সান্তনা দিলেন এবং ফরমালেন, সামনে যে টিলা আছে, এর পিছন দিয়ে এক কাল রং এর হাবশী গোলাম উষ্ট্রীর উপর আরোহন করে যাচ্ছে। ওর কাছে পানির একটি মোশক আছে। ওকে উষ্ট্রীসহ আমার কাছে নিয়ে এসো। নির্দেশ মত কয়েকজন টিলার ওপারে গিয়ে দেখলো যে বাস্তবিকই উষ্ট্রীই উপর আরোহন করে এক হাবশী যাচ্ছে। ওরা সেই হাবশীকে হুযূরের কাছে নিয়ে আসলো, হুযূর ওর কাছ থেকে মোশকটা নিয়ে সেটার উপর তাঁর রহমতের হাতটা বুলায়ে ওটার মুখ খুলে দিলেন এবং ফরমালেন, এখন তোমরা যে রকম তৃষ্ণান্ত হওনা কেন, এসো পানি পান করে নিজেদের তৃষ্ণা নিবারণ কর। কাফেলার সবাই সেই মোশক থেকে প্রবাহিত রহমতের ঝর্ণা থেকে পানি পান করতে শুরু করলেন এবং সবাই নিজ নিজ পাত্রও ভরে নিতে লাগলেন। এভাবে সবাই তৃপ্ত হলেন এবং সবাই পাত্রও ভরে নিলেন। হুযূরের এ মুজিজা দেখে সেই হাবশী গোলাম ভীষণ আশ্চর্য হলে গেল এবং হুযূরের হাত মোবারকে চুমু দিতে লাগলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর নুরানী হাত ওর মুখের উপর বুলায়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই হাবশীর কাল রং উজ্জ্বল সাদা রং এ রূপান্তরিত হয়ে গেল। অতঃপর সেই হবশী কলেমা পড়ে নিজের অন্তরকেও আলোকিত করে নিল।

মুসলামান হয়ে সে যখন স্বীয় মুনিবের কাছে ফিরে গেল, তখন মুনিব জিজ্ঞেস করলো তুমি কে? সে বললো, আপনার গোলাম। মুনিব বললো, তুমি, মিথ্যা বলছ, আমার গোলামের গায়ের রং তো কালো। সে বললো, আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমি সেই নূরের উৎস বরকতময় সত্ত্বা (দঃ) এর সাথে দেখা করে তাঁর উপর ঈমান এনে এসেছি। যিনি সমগ্র সৃষ্টিকূল আলোকিত করেদিয়েছেন। সমস্ত কাহিনী শুনে, মুনিবও মুসলমান হয়ে গেল। (মছনবী শরীফ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূর আল্লাহর অনুমতিতে উভয় জাহানের কল্যাণকারী এবং মছিবতের সময় সাহায্যকারী। এরপরও যদি কেউ এ রকম বলে যে, হুযূর কারো সাহায্য করঁতে পারেন না এবং কারো ফরিয়াদ শুনেন না, তাহলে সে মস্তবড় জাহিল ও অজ্ঞ।

মেঘমালার উপর কর্তৃত্ব

মদীনা মনোয়ারায় একবার বৃষ্টি না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়ে ছিল। লোকেরা খুবই চিন্তিত হলো। এক জুমাবারে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন খুতবা দিচ্ছিলেন, এক বেদুইন দাঁড়িয়ে আরয করলো, ইয়া রসুলল্লাহ! ক্ষেত খামার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সন্তান-সন্ততি উপবাস থাকছে। আপনি দুআ করুন, যেন বৃষ্টি হয়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তাঁর প্রিয় নুরানী হাত মুবারক উঠালেন (বর্ণনাকারীর বক্তব্য) আসমান তখন একেবারে পরিষ্কার ছিল। মেঘের কোন নাম নিশানা ছিল না। কিন্তু মদনী সরকারের হাত মুবারক উঠানো মাত্রই পাহাড়ের মত মেঘে ছেয়ে গেল। দেখতে দেখতে বৃষ্টি পড়তে লাগলো। হুযূর তখনও মিম্বরে ছিলেন, ছাদ টপকিয়ে পানি পড়তে ছিল এবং হুযূরের দাঁড়ি মুবারক থেকে পানির ফোঁটা নিচে পড়তে ছিল। এ বৃষ্টি আর বন্ধ হয় না। পরবর্তী জুমার দিন হুযূর যখন খুতবা দিতে উঠলেন, তখন সেই বেদুইন, যে এর আগের জুমায় বৃষ্টি না হওয়ার কারণে কষ্টের কথা আরয করেছিল, দাঁড়িয়ে আরয করলো, ইয়া রসুলল্লাহ! এখনতো ক্ষেতখামার ডুবে যাচ্ছে, ঘরবাড়ী পড়ে যাচ্ছে। আপনি দুআ করুন যেন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তখন তাঁর প্রিয় নুরানী হাত মুবারক উঠালেন এবং স্বীয় আঙ্গুলী মুবারক দ্বারা ইশারা করে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! আমাদের আশে পাশে বৃষ্টি হোক কিন্তু আমাদের উপর বৃষ্টি পতিত না হোক, হুযূরের ইশারা করা মাত্রই যে দিকে হুযূরের আঙ্গুলী মুবারক গেছে সেদিকে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে এবং মদীনা মনোয়ারার উপরস্থ আসমান পরিস্কার হয়ে গেল। (মিশকাত শরীফ ৫২৮ পৃঃ)

সবক ঃ সাহাবায়ে কিরাম যে কোন বিপদের সময় হুযূরের বারগাহে ফরিয়াদ নিয়ে আসতেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এখানে সব সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। এখনও আমরা হুযূরের মুখাপেক্ষী, হুযূরের ওসীলা ব্যতীত আমরা আল্লাহ থেকে কিছুই পেতে পারি না। মেঘমালার উপরও হুযূরের কর্তৃত্ব রয়েছে।

কাহিনী নং - ১৯

চাঁদের উপর কর্তৃত্ব

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শত্রুরা বিশেষ করে আবু জেহেল একবার

হুযূরকে বললো, তুমি যদি সত্যই আল্লাহর রসুল হও, তাহলে আসমানের চাঁদকে দু' টুকরা করে দেখাও দেখি। হুযূর ফরমালেন, ঠিক আছে, এটাও করে দেখাচ্ছি। এ বলে তিনি যখন চাঁদের দিকে স্বীয় আঙ্গুল মুবারক দ্বারা ইশারা করলেন তখন চাঁদ দু'টুকরা হয়ে গেল। এটা দেখে আবু জেহেল আশ্চর্যন্বিত হয়ে গেল। কিন্তু বেঈমান তবুও এটা মেনে নিল না বরং হুযূরকে যাদুকর বলতে লাগলো, (বোখারী শরীফ ২৭১২ পৃঃ ২ জি ঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূরের হুকুমত চাঁদের উপরও চলে। এত বড় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বেঈমান লোকেরা হুযূরের এখতিয়ার ও কর্তৃত্বকে মানে না।

কাহিনী নং - ২০

সূর্যের উপর কর্তৃত্ব

একদিন মকামে সুহবায় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জোহরের নামায আদায় করলেন। অতঃপর হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) কে কোন এক কাজের জন্য বাইরে পাঠালেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ফিরে আসার আগে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আসরের নামাযও পড়ে নিলেন। হযরত আলী যখন ফিরে আসলেন, তখন তাঁর কোলে পবিত্র মস্তক মুবারক রেখে হুযূর শুয়ে গেলেন, হযরত আলী কিন্তু তখনও আসরের নামায আদায় করেননি। এদিকে সূর্য ডুবন্ত অবস্থায় ছিল। হযরত আলী চিন্তা করতে লাগলেন যে, এদিকে রসূলে খোদা আরাম করছেন ওদিকে নামাযের ওয়াক্ত চলে যাচ্ছে। রসূলে খোদার আরামকে যদি প্রাধান্য দি, তাহলে নামাযের সময় চলে যায় আর নামায পড়তে চাইলে হুযূরের আরামের ব্যাঘাত হয়, কি করা যায়? শেষ পর্যন্ত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এ সিদ্ধান্ত নিলেন যে নামায কাযা হোক কিন্তু হুযূরের ঘুমের ব্যাঘাত না হওয়া চায়। এ অবস্থায় সূর্য ডুবে গেল, আসরের ওয়াক্তও শেষ হয়ে আসলো। হুযূর জাগ্রত হয়ে হযরত আলীকে চিন্তাযুক্ত দেখে এর কারণ জানতে চাইলেন। হযরত আলী আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আমি আপনার আরামের ব্যাঘাত না করার খাতিরে এখনও আসরের নামায আদায় করিনি, অথচ সূর্য ডুবে গেল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন চিন্তা কিসের সূর্য এক্ষনি ফিরে আসতেছে এবং সেই জায়গায় এসে থামতেছে, যেখানে আসরের সময় হয়। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুআ করার সাথে সাথে ডুবন্ত সূর্য উঠে আসলো এবং পশ্চাৎ গমন করে ঐ জায়গায় এসে দাড়ালো, যেখানে

আসরের সময় হয়। হযরত আলী উঠে আসরের নামায পড়ে নিলেন। এরপর সূর্য ডুবে গেল। (হুজ্জাতিল্লাহে আলাল আলামীন ৩১৮ পৃঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর হুকুমত সূর্যের উপরও চলে। তিনি সৃষ্টিকূলের প্রতিটি অনু পরমানুর উপর কর্তৃত্বকারী। তাঁর মত কেউ হয়নি, হবে না, হতে পারে না।

কাহিনী নং - ২১

জমীনের উপর কর্তৃত্ব

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে সাথে নিয়ে মক্কা শরীফ থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন, তখন মক্কার কোরাইশ ঘোষণা দিল যে, যে কেউ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও ওনার সাথী ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে গ্রেপ্তার করে আনতে পারবে, ওকে একশটি উট পুরস্কার দেয়া হবে। সোরাকা বিন জাশম এ ঘোষনা শুনা মাত্র তার দ্রুত গামী ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে পড়লো। ঘোড়ার উপর বসে সে দম্ভভরে বললো আমার এ তেজী ঘোড়া মুহাম্মদ ও আবু বকরের পিছু নিবে এবং এক্ষুনি ওদের দুজনকে ধরে নিয়ে আসবো। এ বলে সে ঘোড়াকে দ্রুত হাকালো এবং অল্পসময়ের মধ্যে হুযূরের কাছাকাছি পৌছে গেল। ছিদ্দিকে আকবর যখন দেখলো যে, সোরাকা ঘোড়া হাকিয়ে ওনাদের পিছু পিছু আসতেছে এবং প্রায় কাছাকাছি পৌছে গেছে, তখন তিনি হুযূরের কাছে আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! সোরাকা আমাদেরকে দেখে ফেলছে, ঐ দেখুন, সে আমাদের পিছু পিছু আসতেছে। হুযূর ফরমালেন, হে ছিদ্দিক, কোন চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছে। এর মধ্যে সোরাকা একেবারে কাছে পৌছে গেল। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) দুআ করলেন। দুআ করার সাথে সাথে জমীন সোরাকার ঘোড়াকে ধরে ফেললো, এর চার পা সমেত পেট পর্যন্ত জমীনে দেবে গেল। সোরাকা এ দৃশ্য দেখে ঘাবড়িয়ে গেল এবং আরয করতে লাগলো, হে মুহাম্মদ! আমাকে ও আমার ঘোড়াকে এ মছিবত থেকে নাজাত দিন। আমি আপনার সাথে ওয়াদা করছি যে আমি ফিরে যাব এবং অন্য যে কেউ আপনার সন্ধানে এদিকে আসতে লাগলে, ওকেও আমি ফিরায়ে নিয়ে যাব। কাউকে আপনার দিকে আসতে দেব না। তখন হুযূরের নির্দেশে জমীন ওকে ছেড়ে দিল।

সবক ঃ আমাদের হুযূরের হুকুম ও ফরমান জমীনের উপরও চলে। সৃষ্টিকুলের প্রতিটি

জিনিস হুযুরের অধীন করে দেয়া হয়েছে। এরপরও যে ব্যক্তির নিজের বউও ওর অনুগামী নয়, সে যদি হুযুরের মত নিজেকে মনে করে, ওর মত কান্ডজ্ঞানহীন বেঅকুফ আর কে থাকতে পারে ?

কাহিনী নং - ২২

বৃক্ষরাজির উপর কর্তৃত্ব

একবার এক বেদুইন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে এসে বললো, হে মুহাম্মদ! তুমি যদি আল্লাহর রসুল হও, তাহলে কোন একটা নমুনা দেখাও। হুযূর ফরমালেন, ঠিক আছে, দেখ, ঐ যে সামনে যে গাছটা খাঁড়া আছে, ওটার কাছে গিয়ে এতটুকু বল যে তোমাকে আল্লাহর রসূল ডাকছেন। কথামত সেই বেদুইন গাছটির কাছে গিয়ে বললো, তোমাকে আল্লাহর রসূল ডাকছেন। বৃক্ষটি এ কথা শুনে ডানে-বামে সামনে পিছে হেলিয়ে দুলিয়ে মাটি থেকে শিকড় আলগা করে চলতে চলতে হুযুরের খেদমতে হাজির হয়ে গেল এবং আরয করলো আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া রসুলল্লাহ! বেদুইন লোকটি হুযূরকে বলতে লাগলো, আপনি গাছটিকে স্বীয় জায়গায় চলে যাবার জন্য বলুন। অতএব হুযূর যখন ফরমালেন, যাও, ফিরে চলে যাও। বৃক্ষটি একথা শুনে পিছনের দিকে ঘুরে গেল এবং স্বীয় জায়গায় গিয়ে পুনরায় আগের মত খাঁড়া হয়ে গেল।

বেদুইন লোকটি এ মুজিজা দেখে মুসলমান হয়ে গেল এবং হুযূরকে সিজদা করার অনুমতি চাইলো। হুযূর ফরমালেন সিজদা করা জায়েয নেই। পুনরায় সে হুযূরের হাত পা মুবারকে চুমু দেয়ার অনুমতি চাইলো তখন হুযূর ফরমালেন, হ্যাঁ, এটা করতে পার। অতঃপর সে হুযুরের হাত-পা মুবারকে চুমু দিল। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৪৪১ পৃঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূরের হুকুম বৃক্ষ রাজির উপরও চলে। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, বুজূর্গানে কিরামের হাত পায় চুমু দেয়া জায়েয আছে। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এটা নিষেধ করেননি।

কাহিনী নং- ২৩

পাগলা উট

বনী নজারের বাগানে এক পাগলা উট কোথা হতে এসে আশ্রয় নিল। বাগানে যে কেউ

গেলে, সেই উট ওকে কামড় দেয়ার জন্য দৌড়ে আসতো। লোকেরা বড় সমস্যায় পড়লো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে এসে সমস্ত ঘটনা আরয করলো। হুযূর ফরমালেন, চলো, আমি যাচ্ছি-এ বলে হুযূর সেই বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সেই উটকে বললেন, এদিকে এসো। উট রসুলল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশ শুনা মাত্র দৌড়ে এসে হাজির হলো এবং হুযূরের কদম মোবারকের উপর মাথা রাখলো। হুযূর বললেন, এর নাফা (নাকের ভিতর যে রশি পরানো হয়) নিয়ে এসো, নাফা আনা হলে হুযূর নিজেই নাফা পরায়ে এর মালিকের হাতে হস্তান্তর করলেন এবং উটটা মালিকের সাথে শান্তভাবে চলে গেল। অতঃপর হুযূর উপস্থিত সাহাবীগণকে ফরমালেন, কাফিরেরা ব্যতীত জমীন আসমানের অধিবাসী সবাই জানে যে আমি আল্লাহর রসূল। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৪৫৮ পৃঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূরের নির্দেশ জীব জন্তুর উপরও চলে। একমাত্র কাফিরেরা ব্যতীত সৃষ্টিকূলের প্রতিটি বস্তু আমাদের হুযূরের রেসালত ও সত্যবাদিতা সম্পর্কে জ্ঞাত।

কাহিনী নং - ২৪

বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি

হিজরতের আগে বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি মক্কার কোরাইশ গোত্রের অধীনে ছিল। উসমান বিন তলহার কাছে এ চাবি থাকতো। সোমবার ও বৃহস্পতিবার বায়তুল্লাহ শরীফ খোলা রাখতো। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এসে উসমান বিন তলহাকে দরজা খোলার জন্য বললেন, কিন্তু সে দরজা খুলতে অস্বীকার করলো। হুযূর ফরমালেন, হে উসমান, আজতো তুমি দরজা খুলতে অস্বীকার করছ, এমন এক দিন আসবে, তখন বায়তুল্লাহ শরীফের চাবি আমার কবজায় হবে, তখন আমি যাকে ইচ্ছে এ চাবি প্রদান করবো। উসমান বললো, সেই দিন কি কোরাইশ বংশের অস্তিত্ব থাকবে না? দেখা যাবে। অতঃপর হিজরতের পর যখন মক্কা বিজয় হলো এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামের বিশাল বাহিনী নিয়ে বিজয়ী বেশে মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন সর্বপ্রথম বায়তুল্লাহ শরীফে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং চাবি রক্ষক উসমানকে ডেকে বললেন, চাবি আমাকে দিয়ে দাও। অগত্যা উসমানকে সেই চাবি দিয়ে দিতে হলো। হুযূর সেই চাবি হাতে নিয়ে উসমানকে লক্ষ্য করে বললেন, উসমান, লও, আমিও তোমাকে চাবিরক্ষক নিয়োজিত করছি, তোমার থেকে কোন জালিমই এই চাবি নিবে।

উসমান যখন পুনরায় চাবি গ্রহণ করলো তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, হে উসমান, তোমার কি সেদিনের কথা স্মরণ আছে, যখন আমি তোমার থেকে চাবি চেয়েছিলাম এবং তুমি দরজা খুলতে অস্বীকার করেছিলে এবং আমি বলে ছিলাম এমন একদিন আসবে, তখন এ চাবি আমার কব্জায় হবে এবং আমি যাকে ইচ্ছে তাকে দিতে পারব। উসমান বললো, হ্যাঁ, হুযূর, আমার স্মরণ আছে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি আল্লাহর সত্যিকার রসূল। (হুজাতুল্লাহে আলল আলামীন ৪৯৯ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর আগে পরের সব বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত এবং কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে, সব তাঁর কাছে সুস্পষ্ট। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন। তিনি অদৃশ্য জ্ঞানী। যা কিছু হয়েছে ও হবে, সব বিষয়ে তিনি জ্ঞাত। অতএব যে ব্যক্তি বলে যে আগামীকাল কি হবে, তা হুযূর জানেন না, ওর থেকে বড় অথর্ব আর কে হতে পারে ?

কাহিনী নং - ২৫

হারানো উষ্ট্রী

তাবুকের যুদ্ধে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর উষ্ট্রী হারিয়ে গিয়েছিল। এক মুনাফেক মুসলমানগণকে বললো, তোমাদের মুহাম্মদতো নবী দাবী করে এবং তোমাদেরকে আসমানের কথা শুনায়। অথচ তাঁর উষ্ট্রীর হদিস তাঁর কাছে নেই। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যখন মুনাফেকের এ কথা শুনলেন, তখন ফরমালেন নিশ্চয়ই আমি নবী এবং আল্লাহ আমাকে অদৃশ্য জ্ঞান দান করেছেন। শুন, আমার উষ্ট্রী অমুক জায়গায় দাঁড়ানো আছে। এক বৃক্ষের সাথে ওর নাকের রশি আটকে গেছে। যাও ওখান থেকে উষ্ট্রীটি নিয়ে এসো। নির্দেশমত সাহাবায়ে কিরাম গিয়ে দেখলেন যে, ঠিকই উষ্ট্রীটি সেই জায়গায় দাঁড়ানো ছিল এবং ওটার নাকের রশিটি এক বৃক্ষের সাথে আটকে গিয়েছিল। (যাদুল মুয়াবেস ৩ পৃঃ ৩ জিঃ হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৫১০ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূরকে আল্লাহ তাআলা এতটুকু ইলমে গায়ব দান করেছেন যে, কোন বিষয় তাঁর কাছে লুকায়িত নেই। কিন্তু মুনাফেকরা তাঁর এ অদৃশ্য জ্ঞানকে অস্বীকার করে।

কাহিনী নং - ২৬

বন্দী চাচা

বদরের যুদ্ধে আল্লাহ তাআলা যখন মুসলমানগণকে জয়যুক্ত করলেন এবং কাফিরদেরকে পরাভূত করলেন, তখন মুসলমানগণের হাতে যারা বন্দী হয়েছিল, তাদের মধ্যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর চাচা হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু) ছিলেন। বন্দীদের থেকে যখন মুক্তিপণ দাবী করা হলো, তখন হযরত আব্বাস বললেন, হে মুহাম্মদ আমিতো গরীব, আমার কাছে তো কিছুই নেই। তুমি যখন আমাকে মক্কায় ত্যাগ করে চলে এসেছিলে তখন বংশের সবার থেকে আমি গরীব ছিলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, তা ঠিক, তবে আপনি যখন কাফিরদের সাথে বদরের যুদ্ধে আসার মনস্থ করলেন, তখন আপনি চাচী -উম্মে ফজলকে গোপন ভাবে যে স্বর্ণের পাতগুলো দিয়ে এসেছেন, সেটা গোপন করছেন কেন ? হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহ আনহু) এ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন এবং হুযূরের এ অদৃশ্য জ্ঞান দেখে মুসলমান হয়ে গেলেন। (দলায়েলে নবুয়াত ১৭১ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কোন বিষয় গোপন নেই। আল্লাহ তাআলা হুযূরকে প্রত্যেক কিছুর জ্ঞান দান করেছেন। ইলমে গায়বও হুযূরের একটি মুজিজা যার উপর প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান রয়েছে।

কাহিনী নং-২৭

কবুতরের বাচ্চা

এক বেদুইন তার কাপড়ের আস্তিত্বের ভিতরে কিছু লুকায়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলো এবং বললো, হে মুহাম্মদ! যদি তুমি বলতে পার যে আমার আস্তিনের ভিতরে কি আছে, তাহলে আমি স্বীকার করবো যে তুমি সত্যিকার নবী। হুযূর ফরমালেন, সত্যিই তুমি ঈমান আনবে? সে বললো হ্যাঁ, ঠিক! আমি ঈমান আনবো। হুযূর ফরমালেন, তাহলে, শুন, তুমি এক জংগল দিয়ে যাচ্ছিলে, পথের ধারে এক গাছ দেখলে, যেখানে কবুতরের বাসা ছিল। সেই বাসায় কবুতরের দুটি বাচ্চা ছিল। তুমি বাচ্চা দুটি ধরে যখন নিয়ে আসতে ছিলে, তখন স্ত্রী কবুতরটি তা দেখে তোমার উপর ঝাপিয়ে পড়ছিল তখন তুমি সেটাকেও ধরে ফেলেছ। এ মূহুর্তে সেই স্ত্রী কবুতর ও বাচ্চাদ্বয় তোমার কাছে তোমার কাপড়ের আস্তিনের ভিতর লুকায়িত আছে।

বেদুইন একথা শুনে বিস্মিত হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোষনা করলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় আপনি আল্লাহর রসূল (জামেউল মুজিজাত ২১ পৃঃ)।

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে কিছু গোপন ছিল না। একজন অজ্ঞ বেদুইন এটা জানতো যে, যিনি নবী তিনি অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী হন। কিন্তু জ্ঞানী গুনীর দাবীদার হয়ে যে নবীর জ্ঞানকে অস্বীকার করে, ওর থেকে বড় মুর্খ ও কাণ্ডজ্ঞাহীন আর কেউ হতে পারে না।

জান্নাতের উষ্ট্রী

হযরত মওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন একদিন বাহির থেকে ঘরে আসলে, হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আমি এ সূতাগুলো কেটেছি। আপনি এগুলো বাজারে নিয়ে বিক্রি করে আটা কিনে আনুন, যেন হাসান-হোসাইনকে রুটি বানিয়ে খাওয়াতে পারি। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) সূতা বাজারে নিয়ে গেলেন এবং ছয় টাকায় বিক্রি করলেন। অতঃপর সেই টাকা দিয়ে কিছু ক্রয় করার মনস্থ করলেন। ইত্যবসরে এক ভিক্ষুক হাঁক দিল, مَن يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. (যে আল্লাহকে উত্তম কর্জ প্রদান করে) হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই টাকা সেই ভিক্ষুককে দিয়ে দিলেন। এর কিছুক্ষণ পর এক বেদুইন আসলো, ওর কাছে এক বড় মোটা তাজা উষ্ট্রী ছিল। সে বললো, হে আলী, এ উষ্ট্রীটি ক্রয় করবেন। হযরত আলী বললেন, আমার কাছে টাকা পয়সা নেই। বেদুইন বললো বাকীতে নিয়ে নাও-এ বলে উষ্ট্রীর রশি ওনার হাতে দিয়ে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর অপর আর একজন বেদুইন উপস্থিত হয়ে বললো, হে আলী, এ উষ্ট্রী বিক্রি করবেন ? হযরত আলী বললেন, নিয়ে নাও। নগদ তিনশ নিন-এ বলে তিনশ দিয়ে বেদুইন উষ্ট্রীটি নিয়ে চলে গেল। এরপর হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রথম বেদুইনকে তালাশ করলেন কিন্তু পাওয়া গেল না। অগত্যা ঘরে ফিরে আসলেন। ঘরে এসে দেখে যে হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর পাশে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বসে আছেন। হযরত আলীকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, আলী, উষ্ট্রীর কাহিনী তুমি নিজে শুনাবে, নাকি আমি শুনাবো? হযরত আলী আরয করলেন, হুযূর, আপনিই শুনান। হুযূর ফরমালেন, প্রথম বেদুইন ছিল জিব্রাইল এবং দ্বিতীয় বেদুইন ছিল ইস্রাফিল এবং উষ্ট্রীটি ছিল জান্নাতের,

যেটার উপর জান্নাতে ফাতিমা আরোহন করবে। আল্লাহর কাছে তোমার দান সেই ছয় টাকা যা ভিক্ষুককে দিয়েছ, খুবই পছন্দ হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা তোমাকে দুনিয়াতে উষ্ট্রীর ক্রয় বিক্রয়ের বাহানায় এর প্রতিদান দিয়েছেন। (জামেউল মুজিজাত ৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালা নিজে উপবাস রয়ে অভাবীদেরকে খাওয়ান। এ কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) অদৃশ্য জ্ঞানী, তাঁর কাছে কোন কিছু লুকায়িত নেই।

কাহিনী নং-২৯

বনের হরিণী

এক জংগলে এক হরিনী বাস করতো, ওর দুটি বাচ্চা ছিল। একবার সে খাদ্যের সন্ধানে বের হয়ে রাস্তার ধারে শিকারীর পাতানো জালে আটকে যায়। তখন সে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো। ওর সুভাগ্য দেখুন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সেই জংগল দিয়ে যাবার সময় ওর নজরে পড়লো। সে হুযূরকে দেখার সাথে সাথে ডাক দিয়ে উঠলো, ইয়া রসুলল্লাহ! আমার প্রতি দয়া করুন। হুযূর ওর ডাক শুনে ওর কাছে গেলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কি সমস্যা? সে বললো, হুযূর আমি এ বেদুইনের জালে আটকে গেছি। আমার দুটি ছোট ছোট বাচ্চা রয়েছে, এ পাহাড়ের কাছেই আছে। আপনি কিছুক্ষণের জন্য আমার জিম্মাদার হয়ে আমাকে ছেড়ে দিন যেন আমি শেষ বারের মত আমার বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাতে পারি। হুযুর, আমি দুধ পান করায়ে ফিরে আসবো। হুযূর ফরমালেন, ঠিক আছে, আমি, জিম্মাদার হয়ে তোমাকে ছেড়ে দিলাম এবং তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করতেছি। তুমি বাচ্চাদের দুধ পান করায়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো।

শিকারী বেদুইনটি মুসলমান ছিল না। সে বলতে লাগলো, আমার শিকার ফিরে না আসলে খুবই খারাপ হবে। হুযূর ফরমালেন, প্রথমে দেখ হরিণী ফিরে আসতেছে কিনা। হারিণী কথামত বাচ্চাদের কাছে গিয়ে দুধ পান করায়ে যথাসময়ে ফিরে আসলো এবং কৃতজ্ঞতা স্বরূপ হুযূরের কদমদ্বয়ের উপর মাথা রাখলো। এ দৃশ্য দেখে বেদুইন স্থির থাকতে পারলোনা, সেও কদম মুবারকে ঝুকে পড়লো। হুযূর উভয়ের মাথার উপর রহমনের হাত মুবারক বুলায়ে ফরমালেন ওহে হরিনী, তুমি জানে বেঁচে গেছ আর হে কাফির শিকারী, তুমি দোযখের আযাব থেকে মুক্তি পেয়ে গেছ। (শিফা শরীফ ৭৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জীব জন্তুদের জন্য রহমত

এবং জীব জন্তুরাও হুযূরের হুকুম মান্য করে। কিন্তু ইনসান হয়ে যারা হুযূরের হুকুম মান্য করে না, তারা পশুর থেকেও অধম।

কাহিনী নং - ৩০

এক বিধর্মিনীর ঘর

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)মক্কা বিজয়ের পর মক্কা মুয়াজ্জমার এক বিধর্মী মহিলার ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে তাঁর কোন এক খাদিমের সাথে কথা বলছিলেন। সেই বিধর্মী মহিলা যখন জানতে পারলো যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওর ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তখন সে হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ঘরের সব জানালা বন্ধ করে দিল, যেন সে হুযূরের কণ্ঠস্বর শুনতে না পায়। সেই মূহুর্তে জিব্রাঈল আমীন উপস্থিত হয়ে আরয করলেনঃ

ইয়া রসুলল্লাহ! আল্লাহ তাআলা ফরমান, যদিওবা এ মহিলা অমুসলিম কিন্তু আপনার শানমান বড় মহৎ, অনেক উচ্চ। যেহেতু এ অমুসলিম মহিলার দেয়ালের সাথে আপনার পিঠ মুবারক লেগেছে, সেহেতু আমি চাই না যে এ গৃহিনী জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ হোক। এ মহিলাতো স্বীয় ঘরের জানালাসমূহ বন্ধ করেছে কিন্তু আমি ওর অন্তরের জানালা খুলে দিয়েছি এবং এটা ওর দেয়ালে আপনার ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর বরকতেরই ফল। ইত্যবসরে সেই মহিলা অস্থির হয়ে ঘর থেকে বের হয়ে আসলো এবং চিৎকার করে বললো আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসূল। (নুজহাতুল মাজালেস ৭৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ অমুসলিম মহিলার ঘরের দেয়ালের সাথে হুযূরের পিঠ মুবারক লাগার কারণে সে দোযখের আগুন থেকে বেঁচে গেল। তাহলে যেই ভাগ্যবতী পবিত্র মহিলা হযরত আমেনা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর গর্ভে হুযূর অবস্থান করেছেন, সেই পবিত্র মহিলা কেন জান্নাতের অধিবাসী হবেন না। ওরা কত বড় বদবখ্‌ত, যারা হুযূরের মা-বাপ সম্পর্কে যা-তা বলে।

কাহিনী নং-৩১

দুগ্ধপোষ্য শিশুর সত্যবানী ঘোষণা

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) একবার সাহাবায়ে কিরামের সমাবেশে তশরীফ রেখেছিলেন। এমন সময় এক বিধর্মী মহিলা তার দুমাস বয়স্ক দুগ্ধ পোষ্য শিশুকে

কোলে নিয়ে সেই দিক দিয়ে যাচ্ছিল। শিশুটি যখন হুযূরকে দেখলেন তখন একেবারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বলে উঠলেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ وَيَا اَكْرَمَ خَلْقِ اللّٰهِ.

অর্থাৎ ঃহে আল্লাহর রসূল হে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত মখলুক! আপনার প্রতি সালাম।

মা তার দু'মাস বয়স্ক শিশুকে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল এবং শিশুকে জিজ্ঞেস করলো, বেটা তোকে এ কথা কে শিখিয়ে দিয়েছে? আর ইনি যে আল্লাহর রসুল তা তোকে কে বলে দিয়েছে? শিশু এবার মাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলো, হে মা! এ কথা আমাকে সেই আল্লাহ শিখিয়েছেন, যিনি সকল মানুষকে এ ধরণের কথা বলার শক্তি দিয়েছেন এবং এ দেখুন আমার মাথার উপর জিব্রাইল দাঁড়িয়ে আছেন, যিনি আমাকে বলছেন যে ইনি আল্লাহর রসূল। মা এ অলৌকিক ঘটনা দেখে সংগে সংগে কালেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। মাওলানা রুমী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) মছনবী শরীফে লিখেছেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) শিশুকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন। তোমার নাম কি? তখন শিশুটি বললো ঃ

عبد عزی پیش این یکمشت چیز- لیك نامم پیش حق عبد العزیز.

অর্থাৎ ঃ ইয়া রসুলল্লাহ! এক মুষ্ঠি মাটির তৈরী এ বান্দার নাম আমার মায়ের কাছে আবদে উয্‌যা কিন্তু আল্লাহর কাছে আবদুল আযিয। (নাযহাতুল মাজালিস ৭২ পৃঃ ২জিঃ)

সবক ঃ দু এক মাসের শিশুও হুযূরকে চিনে ও মান্য করে এবং নিজের মাকেও জান্নাতে নিয়ে যায়। কিন্তু আফসোস! ঐসব বয়স্ক বদবখতের জন্য যারা হুযূরকে চিনলো না ও মান্যও করলো না, স্বীয় গুমরাহী ও বেআদবী দ্বারা নিজেও ডুবলো এবং অন্যদেরকেও ডুবালো।

কাহিনী নং- ৩২

রাতের চোর

একবার হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) হযরত আবু হোরাইরা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে সদকায়ে ফিতরের মালামাল হেফাজতের জন্য নিয়োজিত করেছিলেন। হযরত আবু হোরাইরা দিনরাত সেই মালের হেফাজত করতে লাগলেন। এক রাতে এক চোর এসে মাল চুরি করতেছিল। হযরত আবু হোরাইরা ওকে দেখে ফেলেন এবং ধরে ফেলেন এবং বলেন আমি তোকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর

খেদমতে হাজির করবো। চোর কাকুতি মিনতি করে বললো, আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে ছেড়ে দিন। আমার পরিবার পরিজন আছে। আমি খুবই অভাবী। একথা শুনে হযরত আবু হোরাইরার দয়া হলো এবং ওকে ছেড়ে দিলেন। সকালে আবু হোরাইরা যখন বারগাহে রেসালতে হাজির হলেন, তখন হুযূর মুচকি হেসে বললেন, আবু হোরাইরা, তোমার রাতের কয়েদী (চোর) কি বললো? আবু হোরাইরা আরয করলেন, হুযূর সে স্বীয় পরিবার পরিজন ও অভাব অনটনের কথা বলায় আমার দয়া হলো। তাই ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর ফরমালেন, সে মিথ্যা বলেছে। সাবধান থেকো, আজ রাতও সে পুনরায় আসবে। হযরত আবু হোরাইরা বলেন, দ্বিতীয় রাতও আমি ওর অপেক্ষায় রইলাম। দেখতে দেখতে ঠিকই সে আসলো এবং মাল চুরি করেতে শুরু করলো। আমি পুনরায় ওকে ধরে ফেললাম। এবারও সে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। আমারও দয়া হলো, তাই আবার ছেড়ে দিলাম। সকালে হুযূরের বারগাহে হাজির হলে হুযূর পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার রাতের কয়েদী (চোর) কি বললো? আমি আরয করলাম, হুযূর! সে আজও তার অভাব অনটনের কথা বলেছে। তাই আমার দয়া হওয়ায় আজও ওকে ছেড়ে দিয়েছি। হুযূর ফরমালেন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে। সাবধান! সে আজও আসবে। হযরত আবু হোরাইরা বলেন, তৃতীয় রাত সে আবার আসলো এবং আমি ওকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, কমবখত! আজ তোকে আর ছাড়বো না, হুযূরের কাছে নিয়ে যাব। সে বললো, জনাব আবু হোরাইরা, আমি আপনাকে কয়েকটি দুআ শিখায়ে যেতে চাই, সেটা পাঠ করার দ্বারা আপনার উপকার হবে। শুনেন, যখন শুইতে যাবেন তখন আয়াতুল কুরসী পাঠ করে শুইবেন। এর দ্বারা আল্লাহ আপনার হেফাজত করবেন এবং শয়তান আপনার কাছে আসতে পারবে না। হযরত আবু হোরাইরা বলেন, সে আমাকে এ বাক্যগুলো শিখায়ে এবারও আমার থেকে রেহাই পেয়ে গেল। সকালে আমি যখন হুযূরের দরবারে পুরা কাহিনী বর্ণনা করলাম, তখন হুযূর ফরমালেন, সে এ কথাটি সত্য বলেছে অথচ সে বড় মিথ্যুক। তুমি কি জান হে আবু হোরাইরা!এ তিনরাতের চোরটা কে? আমি আরয করলাম, জ্বিনা, ইয়া রসুলল্লাহ! আমি জানিনা। হুযূর ফরমালেন, সে ছিল শয়তান। (মিশকাত -১৭৭ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিগত ও ভবিষ্যতের সব ঘটনাবলী জানেন। হযরত আবু হোরাইরার কাছে রাতে চোর আসলো, কিন্তু সকালে হুযূর নিজেই বললেন, আবু হোরাইরা! রাতের কয়েদী কি বললো? এটাও বলেছেন, আজ পুনরায় আসবে। ঠিকই তাই হয়েছিল। এতে বুঝা গেল, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যা হয়েছে এবং যা হবে, সব বিষয়ে জ্ঞাত।

কাহিনী নং - ৩৩

নেকড়ে বাঘের সাক্ষ্য

মদীনা মনোয়ারার কোন এক পাহাড়ী এলাকায় এক রাখাল ছাগল চড়াতে ছিল। হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে ছাগলের পালের ভিতর ঢুকে একটি ছাগল নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। রাখাল ধাওয়া করে বাঘ থেকে ছাগলটি উদ্ধার করলো। বাঘ যখন দেখলো যে ওর শিকারটা কেড়ে নিয়ে নিল, তখন এক টিল্লার উপর উঠে সুস্পষ্ট ভাষায় বলতে লাগলো, ওহে রাখাল! আল্লাহ আমাকে রিজিক দিয়েছিল কিন্তু আফসোস! তুমি তা আমার থেকে ছিনিয়ে নিলে। রাখাল বাঘকে কথা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললো আশ্চার্য ব্যাপার! বাঘও কথা বলে! বাঘ পুনরায় বললো, এর থেকে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হলো যে মদীনা শরীফে এমন এক মহান ব্যক্তি রয়েছেন যিনি তোমাদেরকে যা কিছু হয়েছে এবং যা কিছু হবে মোট কথা আগে পরের সব বিষয়ের খবর দেন কিন্তু তোমরা উনার প্রতি ঈমান আননা। রাখাল লোকটি ইহুদী ছিল। বাঘের মুখে এ সাক্ষ্য শুনে খুবই প্রভাবিত হলো এবং হুযূরের বারগাহে হাজির হয়ে মুসলমান হয়ে গেল (মিশকাত শরীফ ৫৩৩ পৃঃ)।

সবক ঃ একটি পশুও জানে ও মানে যে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বিগত ও ভবিষ্যতের বিষয় জানেন কিন্তু মানুষ নামধারী এমন জানোয়ারও আছে, যে (মাযাল্লা) হুযূরের বেলায় দেয়ালের পিছনের জ্ঞানও স্বীকার করে না।

কাহিনী নং- ৩৪

নেক আক্বীদাবান গাধা

খায়বর যুদ্ধ জয়ের পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফিরে আসছিলেন। পথে তাঁর খেদমতে এক গাধা উপস্থিত হয়ে আরয করতে লাগলো, হুযূর ! আমার আবেদনটি মেহেরবাণী করে শুনে যান। রহমতে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ অসহায় পশুর নিবেদন শুনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ফরমালেন, কি বলতে চাও, বল। গাধা বললো, হুযূর আমার নাম ইয়াযিদ বিন শাহাব। আমার পূর্ব পুরুষের বংশে আল্লাহ তাআলা ষাটটি গাধা পয়দা করেছিল। ও গুলোর উপর আল্লাহর নবীগণ আরোহন করেছেন। হুযূর, আমার আন্তরিক বাসনা হলো আপনিও যেন আমার উপর আরোহন করেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আমি এ কথা বলার হকদারও বটে। কেননা

আমার বংশের মধ্যে এখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই এবং আল্লাহর রসুলের মধ্যেও এখন আপনি ছাড়া আর কেউ নেই।

হুযূর গাধার এ মনোবাসনা শুনে ফরমালেন, ঠিক আছে, আমি তোমাকে আমার বাহন হিসেবে গ্রহণ করলাম এবং তোমার নামের পরিবর্তন করে ইয়াফুর রাখলাম। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৪৬০ পৃঃ)

সবক ঃ একটি গাধাও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর খতমে নাবুয়াতের কথা স্বীকার করে। কিন্তু মানুষ হয়ে যে খতমে নবুয়াত অস্বীকার করে না, সে গাধা থেকেও অধম।

কাহিনী নং - ৩৫

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ও মলকুল মউত

হুযূর সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর যখন রেছাল শরীফের সময় হলো, তখন মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত জিব্রাইলকে সাথে নিয়ে হাজির হলো। হযরত জিব্রাইল আমীন আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! মৃত্যুর ফিরিশতা এসেছে এবং আপনার অনুমতি প্রার্থনা করছে। হুযূর, সে আজ পর্যন্ত কোন সময় কারো থেকে অনুমতি নেয়নি এবং আপনার পরেও কারো থেকে অনুমতি নেবে না। আরও বললেন, হুযূর! আপনি অনুমতি দিলে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করতে পারে। হুযূর! ফরমালেন, মৃত্যুর ফিরিশতাকে সামনে আসতে বল। অতঃপর মৃত্যুর ফিরিশতা সামনে এগিয়ে এলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে এটা বলে দিয়েছেন যে আপনার প্রতিটি নির্দেশ যেন পালন করি এবং আপনি যা বলবেন, তাই করবো। অতএব আপনি যদি বলেন, তাহলে রূহ কবজ করবো অন্যথায় ফিরে যাব। হযরত জিব্রাইল আরয করলেন, হুযূর! আল্লাহ তাআলা আপনার বেছাল কাম্য করছেন। তখন হুযূর মৃত্যুর ফিরিশতাকে বললেন, হে মলকুল মউত! তোমাকে জান কবজ করার অনুমতি দিলাম। জিব্রাইল বললেন, হুযূর, পৃথিবীতে আমর আগমন বন্ধ হয়ে গেল। পৃথিবীতে এটা আমার শেষ আগমন। কেননা আপনার জন্যইতো পৃথিবীতে আমার আগমন। এরপরে মৃত্যুর ফিরিশতা রূহ মুবারক কবজ করে ধন্য হলো। মওয়াহেবে লদুনিয়া ৪৭১ পৃঃ মিশকাত ৫৪১ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর এত বড় শান যে সেই মৃত্যুর ফিরিশতা, যিনি রাজা বাদশাহ কারো থেকে অনুমতি নেয় না। হুযূরের খেদমতে হাজির হয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং এ রকম বলেন, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে জান কবজ করবো অন্যথায় ফিরে যাব। আল্লাহ তাআলা ওকে এ হুকুম দিয়ে পাঠিয়েছেন যে, আমার মাহবুবের আনুগত্য কর। তিনি যা বলেন, তাই কর। হুযূরকে যারা নিজেদের মত বলে, ওরা কত বড় গুমরাহ। ওদের কাছে কি আজরাইল কোন সময় অনুমতি চেয়েছিলেন ?

কাহিনী নং - ৩৬

শাহী সংবর্ধনা

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর বেছাল শরীফের সময় জিব্রাইল আমীন উপস্থিত হলেন এবং আরয করতে লাগলেন, ইয়া রসুলল্লাহ! আজ আসমানসমূহে আপনার সংবর্ধনার প্রস্তুতি চলছে। আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের দারোগা হযরত মালেককে এ বলে নির্দেশ দিয়েছেন -মালেক! আমার হাবীবের রূহ মুবারক আসমানে তশরীফ আনতেছে। এ উপলক্ষে আজ দোযখের আগুন নিভায়ে দাও। জান্নাতের হুরদেরকে বললেন, তোমরা নিজেদের সাজসজ্জা কর এবং সমস্ত ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিলেন, মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রূহ মুবারকের সম্মানের জন্য সবাই কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে যাও। আর আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, আমি যেন আপনার খেদমতে হাজির হয়ে আপনাকে এ সুখবর প্রদান করি যে, যতক্ষণ আপনি ও আপনার উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করবেন না, ততক্ষণ সমস্ত নবী ও ওনাদের উম্মতগণের জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ থাকবে এবং কাল কিয়ামতে আল্লাহ তাআলা আপনার উসীলায় আপনার উম্মতের উপর বখশীশ ও ক্ষমার এমন বারিধারা বর্ষন করবেন যে এতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। (মুদারেজুন নবুয়াত ২৫৪ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শানমান উভয় জগতে রয়েছে। জ্বীন, মানুষ, হুর, ফিরিশতা সবাই হুযূরের খাদেম ও বাহিনী। তিনি উভয় জাহানের বাদশাহ।

কাহিনী নং-৩৭

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)এর গোসল মুবারক

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর গোসল মুবারকের সময় সাহাবায়ে কিরাম চিন্তা করতে লাগলেন এবং পরস্পর আলোচনা করতে লাগলেন যে, যেভাবে অন্য লোকদের কাপড় খুলে গোসল দেয়া হয়, হুযূরকে কি সেভাবে কাপড় মুবারক খুলে গোসল দেয়া হবে, নাকি কাপড়সহ গোসল দেয়া হবে । এ বিষয়ে আলোচনা হচ্ছিল। হঠাৎ সবের উপর ঘুমের আবির্ভাব হলো এবং সবের মাথা বুকের উপর ঝুকে পড়লো। অতপর সবার কানে একটি আওয়াজ আসলো, কোন একজন বলছিল, তোমরা জাননা? ইনি কে? সাবধান! ইনি আল্লাহর রসুল। ওনার কাপড় খুলবে না, ওনাকে কাপড় সমেত গোসল দাও। অতঃপর সবার চোখ খুলে গেল এবং হুযূরকে কাপড় সমেত গোসল দেয়া হলো। (মওয়াহেবে লদুনিয়া ৩৭৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর শান সবার থেকে আলাদা ও বৈশিষ্ট্যময়। তাঁর অনুরূপ কোন ব্যক্তি হতে পারে না। তাঁর জিন্দেগী, বেছাল শরীফ, গোসল শরীফ, তাঁর রওজা মুবারকের শান, মোট কথা তাঁর প্রতিটি বিষয় বৈশিষ্ট্যময়। কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে তাঁর অনুরূপ হতে পারে না।

কাহিনী নং-৩৮

রওজা মুবারক থেকে আওয়াজ

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর দাফনের তিন দিন পর এক বেদুইন রওজা মুবারকে হাজির হয়ে রওজার সামনে পতিত হয়ে রওজা শরীফের মাটি স্বীয় মাথায় দিতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, ইয়া রসুলল্লাহ! আপনি যা কিছু বলেছেন, তা আমরা শুনেছি। আপনার মুখে আমরা কোরানের এ আয়াতটিও শুনেছি ঃ ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك. অর্থাৎ যারা নিজেদের নফসের প্রতি জুলুম করে আপনার সমীপে হাজির হয়। অতএব হে আল্লাহ রসূল! আমি নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং এখন গুনাহ মাফের জন্য আপনার সমীপে হাজির হয়েছি। বেদুইন এ কথা বলার সাথে সাথে রওজা মুবারক

থেকে আওয়াজ আসলো, যাও, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। (হুজাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৭৭৭ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রহমতের দরবার বেছাল শরীফের পরও যথারীতি চালু রয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্বীয় বেছালের পরও গুনাহগারদের জন্য নাজাতের উসীলা এবং ফয়েজ ও বরকতের উৎস হিসেবে বিদ্যমান। এখনও আমরা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর মুখাপেক্ষী।

কাহিনী নং-৩৯

রওজা মুবারক থেকে আযানের আওয়াজ

যে সময় ইয়াজিদ বাহিনী মদীনা মনোয়ারা আক্রমন করেছিল, সে সময় তিন দিন মসজিদে নববীতে আযান হতে পারেনি। হযরত সাঈদ বিন মুসিয়াব (রাদি আল্লাহু আনহু) এ তিন দিন মসজিদে নববীতে ছিলেন। তিনি বলেন, নামাযের ওয়াক্ত কখন হতো তা জানার কোন সুযোগ আমার ছিল না। তবে যখন নামাযের সময় হতো তখন রওজা মুবারক থেকে আযানের মৃদু আওয়াজ ভেসে আসতো। (মিশকাত শরীফ ৫৩৭ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রওজা মুবারকে জীবিত আছেন, যারা (মাযাল্লা) বলে যে হুযুর মরে মাটির সাথে মিশে গেছেন, তারা বড় জাহেল ও রসূলের সাথে বেয়াদবীকারী।

কাহিনী নং-৪০

আসমানের কান্না

মদীনা মনোয়ারায় এক বার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি মোটেই হচ্ছিলনা। জনসাধারন উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর খেদমতে ফরিয়াদ নিয়ে হাজির হলো। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) ফরমালেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রওজা পাকের ছাদে একটি ছিদ্র করে দাও, যেন

আসমান ও রওজা পাকের মাঝখানে কোন কিছু আড়াল হয়ে না থাকে। পরামর্শ মুতাবেক লোকেরা তাই করলো। তখন এমন বৃষ্টি হলো যে ক্ষেতসমূহ শষ্য শ্যামল হয়ে গেল, পশু পাখী মোটা তাজা হয়ে গেল। মুহাদ্দেসীনে কিরাম বলেন যে, আসমান যখন নুরানী কবর দেখলো, তখন কেঁদে দিয়েছিল। (মিশকাত শরীফ ৫২৭ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ফয়েজ বেছালের পরও যথাযত জারী আছে। হুযুরের রওজা পাক জেয়ারতের দ্বারা প্রত্যেকের চক্ষু অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে যায়, আল্লাহ থেকে কিছু পাওয়ার জন্য হুযুরের উসীলা প্রয়োজন।

কাহিনী নং-৪১

হযরত বেলালের স্বপ্ন

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত কালে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। হযরত বেলাল বিন হারেছ (রাদি আল্লাহু আনহু) রওজা পাকে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ! আপনার উম্মত বৃষ্টির অভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ওনাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং ফরমালেন, হে বেলাল! ওমরের কাছে যাও। ওকে আমার সালাম দিও এবং বলিও বৃষ্টি হবে। ওমরকে এটাও বলিও যেন কিছুটা নমনীয়তা গ্রহণ করে (এটা হুযূর এ জন্য বলেছেন যে হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) দীনের ব্যাপারে খুবই কঠোর ছিলেন।) হযরত বেলাল স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দেশ মুতাবেক হযরত ওমরের খেদমতে হাজির হলেন এবং হুযূরের সালাম ও পয়গাম পৌঁছালেন। হযরত ওমর এ সালাম ও পয়গাম পেয়ে খুবই কান্নাকাটি করলেন এবং খুব বৃষ্টিও হলো। (শওয়াহেদুল হক ৬৭ পৃঃ)

সবক ঃ উপরোক্ত কাহিনী থেকে বুঝা গেল যে, সাহাবায়ে কিরাম বিপদের সময় হুযূরের খেদমতে হাজির হতেন এবং সেখানেই সব সমস্যার সমাধান পেতেন। এটাও বুঝা গেল যে হযরত ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উচ্চ এবং তিনি বরহক খলীফা ছিলেন। তিনি এত সুভাগ্যবান যে, হুযূরের বেছাল শরীফের পরও সালাম ও পয়গাম লাভ করেন।

কাহিনী নং-৪২

উম্মে ফাতেমার ফরিয়াদ

সিকন্দরীয়ার অধিবাসী উম্মে ফাতিমা নামে এক মহিলা মদীনা মনোয়ারায় হাজির হওয়ার পর, ওর এক পা ক্ষত ও অবশ হয়ে যায়। ফলে চলা ফেরা করতে অক্ষম হয়ে গেল। লোকেরা মক্কা মুয়াজ্জামার দিকে যাত্রা দিল কিন্তু সে যেতে পারলো না। একদিন সে কোন প্রকারে রওজা পাকে হাজির হলো এবং রওজা পাক তওয়াফ করতে করতে বললো, - ইয়া হাবীবল্লাহ! ইয়া রসুলল্লাহ! লোকেরা চলে গেল। আমি রয়ে গেলাম। হুযূর, আমাকে হয়তো পাঠানোর ব্যবস্থা করুন অথবা আপনার সমীপে তলব করুন। সে এ রকম বলতে ছিল। ইত্যবসরে তিনজন আরবী যুবক মসজিদে নববীতে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, মক্কা মুয়াজ্জমায় কে যেতে চাচ্ছে? উম্মে ফাতেমা সঙ্গে সঙ্গে বললো, আমি যেতে চাচ্ছি। ওদের মধ্যে একজন ওকে বললো, তুমি দাঁড়াও। উম্মে, ফাতেমা বললো, আমি দাঁড়াতে পারি না। যুবকটি বললো, আপনার পা লম্বা করুন, সে পা লম্বা করলো। যখন ওরা ক্ষত পা দেখলো, তখন ওরা তিন জনই বলে উঠলো ঠিক আছে, এ সে। অতঃপর ওরা ওকে উঠায়ে বাহনের উপর বসায়ে দিল এবং মক্কা মুয়াজ্জামায় পৌছায়ে দিল। উম্মে ফাতেমা ওদের এ সহযোগিতার কারণ জিজ্ঞেস করলে, ওদের একজন বললো, আমাদেরকে স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নির্দেশ দিয়েছেন-এ মহিলাকে মক্কায় পৌছায়ে দাও। উম্মে ফাতেমা বলেন, আমি খুব আরামে মক্কায় পৌছে গেলাম। (শওয়াহেদুল হক ১৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এখনও প্রত্যেক ফরিয়াদীর ফরিয়াদ শুনেন এবং প্রত্যেক সমস্যার সমাধান দেন। তবে শর্ত হলো যে ফরিয়াদী মনে প্রাণে এবং আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে ইয়া হাবীব ইয়া রসূল বলারও অভ্যস্থ হওয়া চাই।

কাহিনী নং-৪৩

এক হাশেমী মহিলা

মদীনা মনোযারায় এক হাশেমী মহিলাকে কতেক লোক জ্বালাতন করতো। একদিন সে হুযূরের রওজায় হাজির হয়ে আরয করলো, ইয়া রসুলল্লাহ! এরা আমাকে জ্বালাতন করছে। রওজা পাক থেকে আওয়াজ আসলো, আমার সেই উত্তম আদর্শ কি তোমার সামনে নেই? শত্রুরা আমাকে কষ্ট দিয়েছে, আমি সবর করেছি। আমার মত তুমিও

সবর কর। সেই মহিলা বললো, আমি বড় সান্তনা পেলাম এবং কয়েকদিন পর দেখলাম যে, জ্বালাতনকারীরা সবাই মরে গেল। (শওয়াহেদুল হক ১৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) সবার ফরিয়াদ শুনেন এবং প্রত্যেক মজলুমের জন্য তাঁর দরবার উন্মুক্ত এবং 'ইয়া রসুলল্লাহ' বলার দ্বারা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষ থেকে রহমত ও সান্তনা পাওয়া যায়।

কাহিনী নং-৪৪

এক অগ্নি উপাসকের কাছে হুযুরের পয়গাম

শিরাযের এক বুজুর্গ হযরত ফাশ (রহমতুল্লাহ আলাইহি) বলেন, আমার ঘরে এক শিশু জন্ম গ্রহণ করে কিন্তু আমার কাছে খরচ করার জন্য কোন টাকা পয়সা ছিল না। তখন মৌসুম ছিল খুবই শীতের, বের হওয়ার উপায় ছিল না। এসব চিন্তা করে শুয়ে পড়লাম। স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর যিয়ারত নছীব হলো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার? আমি আরয করলাম, হুযুর ব্যয় ভার বহন করার মত আমার কাছে কিছু নেই, তাই এ নিয়ে খুবই চিন্তায় পড়েছি। হুযূর ফরমালেন, সকালে অমুক অগ্নি উপাসকের ঘরে যেও এবং ওকে বলিও, তোমাকে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন যে, আমাকে বিশ দিনার দেয়ার জন্য। হযরত ফাশ (রহমতুল্লাহ আলাইহি) সকালে ঘুম থেকে উঠে চিন্তায় পড়লেন যে, একজন অগ্নি উপাসকের ঘরে কিভাবে যাই এবং কি করে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর পয়গাম ওকে শুনাই। এটাও সত্য যে স্বপ্নে রসূলকে দেখলে সত্যিকার রসূলই হয়ে থাকে। এ দৌদল্যমান অবস্থায় সেই দিন চলে গেল। দ্বিতীয় রাত পুনরায় হুযূরের যিয়ারত নছীব হলো, হুযুর ফরমালেন তুমি ওসব চিন্তা ভাবনা ত্যাগ কর। অগ্নি উপাসকের কাছে গিয়ে আমার পয়গাম পৌছাও। সে মতে সকালে ঘুম থেকে উঠে আমি আগ্নি উপাসকের ঘরের দিকে যাত্রা দিলাম। গিয়ে দেখি সেই অগ্নি উপাসক স্বীয় হাতে কিছু নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। যখন আমি ওর কাছে পৌছলাম, তখন একেত অপরিচিত, দ্বিতীয়তঃ প্রথমবার এসেছি, তাই লজ্জায় কিছু বলতে পারলাম না। সেই অগ্নি উপাসক নিজেই বললো, বড় মিয়া! কি কোন কিছু বলার আছে ? আমি বললাম, হ্যাঁ, আমাকে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তোমার কাছে পাঠিয়েছেন এবং আমাকে বিশ দিনার দেয়ার জন্য বলেছেন। মজুসী (অগ্নি উপাসক) স্বীয় হাত খুললো এবং বললো, নিন, এ বিশ দিনার আমি আপনার জন্য হাতে নিয়ে রেখেছি এবং আপনার অপেক্ষায় ছিলাম। হযরত ফাশ দিনার গুলো নিলেন এবং মজুসীকে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আমিতো স্বপ্নে রসূলুল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে

এখানে এসেছি। কিন্তু আমি যে আসবো এটা তোমার কিভাবে জানা হলো? সে বললো, আমি রাত্রে এ রকম আকৃতির একজন নুরানী বুজুর্গকে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন-কাল তোমার কাছে এক অভাবী ব্যক্তি আসবে, ওকে বিশটি দিনার দিও। তাই এ বিশ দিনার হাতে নিয়ে কাল থেকে অপেক্ষা করছি। হযরত ফাশ (রহমতুল্লাহ আলাইহি) ওর মুখে যখন রাত্রে সাক্ষাত প্রাপ্ত নুরানী বুজুর্গের আকৃতির কথা শুনলেন, তখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, উনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ছিলেন। তাই হযরত ফাশ ওকে বললেন, সেই নূরানী ব্যক্তিটা ছিলেন রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)। এ কথা শুনে মজুসী কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো, আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে চলুন। অতঃপর সে হযরত ফাশ (রহমতুল্লাহ আলাইহি) এর ঘরে এসে মুসলমান হয়ে গেল। ওর দেখা দেখি ওর পরিবার পরিজনের সবাই মুসলমান হয়ে গেল। (শওয়াহেদুল হক ১৬৯ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর রহমতের দৃষ্টি যার উপরই পতিত হয়, ওর কেল্লা ফতেহ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্বীয় অভাবী বান্দাদের ফরিয়াদ শুনেন এবং বেছাল শরীফের পরও অভাবীদের সাহায্য করেন।

কাহিনী নং-৪৫

স্বপ্নে প্রাপ্ত দুধ

হযরত শেখ আবদুল্লাহ (রহমতুল্লাহ আলাইহি) বলেন, একবার আমি মদীনা মনোয়ারায় মসজিদে নববীর মেহরাবের কাছে এক বুজুর্গ ব্যক্তিকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন এবং জাগা মাত্রই রওজা পাকের কাছে গিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি সালাম পেশ করলেন এবং মুচকি হেসে ফিরে আসছিলেন। সেখানকার একজন খাদেম তাঁর এ মুচকি হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, আমি খুবই ক্ষুধার্ত ছিলাম। এ অবস্থায় আমি রওজাপাকে এসে ক্ষুধার অভিযোগ করি। স্বপ্নে আমি হুযূরকে দেখলাম। তিনি আমাকে এক কাপ দুধ প্রদান করলেন। আমি পেটভরে সেই দুধ পান করলাম। অতঃপর সেই বুজুর্গ তাঁর হাতের তালুতে মুখ থেকে থুথু ফেলে দেখালেন যে তখনও দুধের লক্ষণ ছিল। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৮০৪ পৃঃ)

সবক ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে যারা স্বপ্নে দেখেন, তারা সত্যিই হুযূরকে দেখেন এবং স্বপ্নে হুযূর যেটা দান করেন, সেটা বাস্তবিকই দান করা হয়। হুযূর আজও সেই রকম জীবিত, যেরকম আগে ছিলেন।

কাহিনী নং-৪৬

স্বপ্নে প্রাপ্ত রুটি

হযরত আবুল খায়ের (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, একবার আমি পাঁচ দিনের উপবাস অবস্থায় মদীনা মনোয়ারায় পৌছেছিলাম। আমি রওজা পাকে হাজির হয়ে প্রথমে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর প্রতি সালাম পেশ করলাম। অতঃপর হযরত আবু বকর ও ওমর (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর প্রতি সালাম পেশ করলাম। এরপর হুযূরের সমীপে আরয করলাম, ইয়া রসুলল্লাহ! আমি তো আপনার মেহমান। আমি পাঁচ দিনের উপবাস। হযরত আবুল খায়ের (রহমতুল্লাহে আলাইহি) বলেন, এরপর আমি মিম্বরের কাছে শুয়ে গেলাম। তখন আমি স্বপ্ন দেখলাম যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তশরীফ এনেছেন, তাঁর ডানে হযরত ছিদ্দিকে আকবর, বামে হযরত ওমর এবং সামনে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহুম) ছিলেন। হযরত আলী আগে গিয়ে আমাকে সজাগ করে দিয়ে বললেন উঠ, দেখ, রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এসেছেন এবং তোমার জন্য খাবার এনেছেন। আমি উঠলাম এবং দেখলাম যে হুযূরের হাতে রুটি। হুযূর সেই রুটি আমাকে প্রদান করলেন। আমি হুযূরের নুরানী কপালে চুমু দিয়ে সেই রুটি নিয়ে নিলাম এবং খেতে লাগলাম। আধা-আধি খাওয়ার পর হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন দেখি, বাকী আধা-রুটি আমার হাতে রয়েছে। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ৮০৫ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বেছাল শরীফের পরও আল্লাহ প্রদত্ত রিজিক বন্টনকারী এবং অভাবীদের সাহায্যকারী। বুজুর্গানে কিরাম নিজেদের অভাব অভিযোগ বারগাহে নববীতে পেশ করতেন। হুযূর বেছালের পরও স্বীয় গোলামদের ফরিয়াদ পূর্ণ করেন।

কাহিনী নং-৪৭

রোমের বাদশাহের কয়েদী

স্পেনের এক নেককার লোকের ছেলেকে রোমের বাদশাহ বন্দী করেছিল। নেক কার লোকটি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর কাছে আর্জি পেশ করার জন্য মদীনা মনোয়ারার উদ্দেশ্যে যাত্রা দিলেন। রাস্তায় এক বন্ধুর সাথে দেখা হলো, বন্ধু জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছ? তখন সে বললো আমার ছেলেকে

রোমের বাদশাহ বন্দী করেছে এবং তিনশ টাকা জরিমানা করেছে। আমার কাছে তো এত টাকা নেই যে, যা দিয়ে ওকে মুক্ত করতে পারবো। তাই আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে ফরিয়াদ করার জন্য যাচ্ছি। বন্ধুটি বললো মদীনা মনোয়ারা যাওয়ার কি প্রয়োজন আছে। প্রত্যেক জায়গা থেকে তো হুযূরের শাফায়াত কামনা করা যায়। নেককার লোকটি বললেন, তা ঠিক, তবুও আমি ওখানে হাজির হবো। সেমতে সে মদীনা মনোয়ারা পৌছে রওজা শরীফে হাজির হয়ে স্বীয় হাজত পেশ করলেন। স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাক্ষাত লাভ করলেন। হুযূর ওকে বললেন, যাও নিজ শহরে ফিরে যাও। ফিরে এসে দেখি, ছেলে ঘরে এসে গেছে। ছেলের কাছে মুক্তি পাওয়ার ঘটনা জানতে চাইলে, ছেলে বললো অমুক রাত আমাকে ও আমার সকল সাথী বন্দীদেরকে বাদশাহ স্বয়ং মুক্তি করে দিয়েছেন। নেক্কার বান্দাটি হিসেব করে দেখলেন যে এটা সেই রাত্রি ছিল, যে রাত সে হুযূরের সাক্ষাত লাভ করেছিলেন এবং হুযূর বলেছিলেন, যাও, নিজ শহরে ফিরে যাও। (হুজ্জাতুল্লাহি আলাল আলামীন ৭৮০পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) প্রত্যেক বিপদ গ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্য করেন এবং রওজা মুবারকে তশরীফ রেখেও স্বীয় উম্মতের সহায়তা করেন। যে কোন জায়গা থেকে তাঁর গোলাম তাঁর সাহায্য কামনা করলে, তিনি তাঁর রহমতের হাত বাড়িয়ে দেন। বুজুর্গানে কিরাম হুযূরের দরবারে বিভিন্ন ফরিয়াদ করতেন এবং কেউ একে শিরক বলেনি।

কাহিনী নং-৪৮

খুনীর মুক্তিলাভ

বগদাদের বিচারপতি ইব্রাহিম বিন ইসহাক এক রাতে স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)কে দেখলেন, হুযূর ওকে ফরমালেন, খুনীকে ছেড়ে দাও। এ নির্দেশ শুনে বাগদাদের বিচারপতি কম্পমান অবস্থায় ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। তিনি জেলখানার কর্মকর্তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের জেল খানায় এমন কোন অপরাধী আছে কি, যে খুনী? কর্মকর্তারা বললো, হ্যাঁ, এমন এক ব্যক্তি আছে, যার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ রয়েছে। বিচারপতি নির্দেশ দিলেন, ওকে আমার সামনে হাজির কর। নির্দেশ মত হাজির করা হলো। বাগদাদের বিচারপতি জিজ্ঞেস করলেন, সত্যি সত্যি বল, ঘটনা

কি? সে বললো, মিথ্যা কখনো বলবো না। যা বলবো, সত্যিই বলবো। ব্যাপার হলো, আমরা কয়েকজন মিলে ফুর্তি ও অসৎকাজ করতাম। একজন বৃদ্ধা মহিলাকে আমরা এ কাছে নিয়োজিত করেছিলাম। সে প্রতি রাতে যে কোন বাহানা করে নানা ভাবে ফুসলিয়ে আমাদের জন্য মহিলা নিয়ে আসতো। এক রাতে এমন এক মহিলা নিয়ে আসলো, যে আমার মনোজগতে আমূল পরিবর্তন এনে দিল। মেয়েটিকে যখন আমাদের সামনে নিয়ে আসলো, সে চিৎকার দিয়ে বেহুশ হয়ে পড়ে। আমি ওকে উঠায়ে অন্য কামরায় নিয়ে গিয়ে হুস করার চেষ্টা করলাম। ওর হুস আসলে আমি ওকে চিৎকার ও বেহুম হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। সে বললো, ওহে নওযোয়ান! আমার ব্যাপারে আল্লাহকে ভর কর। এ বৃদ্ধা আমাকে বাহানা করে এখানে নিয়ে এসেছে। দেখ, আমি একজন ভদ্রঘরের মহিলা এবং সৈয়দ বংশীয়। আমার নানা হচ্ছে রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এবং আমার মা হচ্ছে ফাতিমাতুজ যহোরা। খবরদার! এ সম্পর্কের কথা স্মরণ রেখ এবং আমার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকওনা। আমি এ সৈয়দা মহিলার মুখের কথা শুনে ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং আমার সাথীদের কাছে সব কথা খুলে বললাম। আরও বললাম যদি পরিনামে মঙ্গল চাও, তাহলে এ পবিত্র ও সম্মানিত মহিলার সাথে কোন প্রকার বেআদবী করনা। কিন্তু আমার বন্ধুরা আমার কথা উল্টা বুঝলো, তারা মনে করলো, আমি ওদেরকে বাদ দিয়ে এককী ভোগ করতে চাচ্ছি। এ ধারনার বশবর্তী হয়ে ওরা আমার বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়ে গেল। আমি বললাম তোমাদের অসৎ উদ্দেশ্য কিছুতেই চরিতার্থ করতে দেব না। লড়বো, মরবো কিন্তু এ সৈয়দ বংশীয় ভদ্র মহিলার প্রতি কুদৃষ্টি কিছুতেই সহ্য করবো না। শেষ পর্যন্ত ওরা আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং ওদের হামলায় আমি আঘাতও পেলাম। ইত্যবসরে ওদের একজন সেই মহিলার কামরার দিকে যেতে চাচ্ছিল। আমি ওকে বাধা দেয়ায় সে আমাকে আক্রমন করলো। তখন আমি ওকে ছুরি দ্বারা পাল্টা আক্রমন করে ওকে মেরে ফেললাম। অতঃপর সেই মহিলাকে নিজের হেফাজতে নিয়ে যখন বের হয়ে আসলাম, তখন চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল এবং আমি ছুরি হাতে ধরা পড়লাম।

বাগদাদের বিচারপতি বললেন, যাও, তোমাকে রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নির্দেশে মুক্তি দেয়া হলো। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৮১৩ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) স্বীয় উম্মতের প্রত্যেক নেক্কার ও বদকার সম্পর্কে অবহিত এবং প্রত্যেক নেক ও বদ আমল দেখেন। হুযুরের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের ব্যাপারে সম্মান প্রদর্শনের দ্বারা মানুষের পরিনাম

ভাল হয়ে যায়। সুতরাং হুযূরের সাথে সম্পর্কিত প্রত্যেক বিষয়ের বেলায় আন্তরিক সম্মানবোধ থাকা উচিত।

কাহিনী নং-৪৯

দ্বীপপুঞ্জের কয়েদী

হযরত ইবনে মীর যাউক বর্ণনা করেন যে, শকর দ্বীপে এক মুসলমানকে শত্রুরা গ্রেফতার করে হাত পা লোহার শিকল দ্বারা বেঁধে জেলখানায় পাঠিয়ে দিল। সেই মুসলমানটি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর নাম নিয়ে ফরিয়াদ করলো এবং জোরে জোরে ইয়া রসূলল্লাহ বলতে লাগলো। কাফিরেরা এ শ্লোগান শুনে বললো, তোমার রসূলকে বল, যেন তোমাকে এ বন্দীদশা থেকে মুক্ত করতে আসে। যখন অর্ধরাত হলো, তখন জেলখানায় একজন লোক এসে সেই কয়েদীকে বললো, উঠ, আযান দাও। কয়েদী উঠে আযান দিতে শুরু করলো, যখন সে أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ এ বাক্য উচ্চারণ করলো, তখন ওর সব শিকল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল এবং সে মুক্ত হয়ে গেল। এরপর ওর সামনে একটি বাগান এসে গেল এবং সে বাগানের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে আসলো। সকালে ওর মুক্তির ঘটনা সমগ্র দ্বীপাঞ্চলে জানাজানি হয়ে গেল। (শওয়াহেদুল হক ১৬২পৃঃ)

সবক ঃ মুসলমানগণ যেন সব সময় নারায়ে রেসালত বলেন। রসূলের শত্রুরাই এ শ্লোগান নিয়ে রসিকতা করে। হুযূরের নাম মুবারক মুশকিল আসানকারী। এ নাম উচ্চারণের সাথে সাথে মুছিবত বিদুরীত হয়ে যায়।

কাহিনী নং -৫০

আটকে পড়া জাহাজ

এক দ্বীনদার ব্যক্তিকে এক কাফির বাদশাহ বন্দী করেছিল। তিনি বলেন, বাদশাহের একটি বড় জাহাজ নদীতে আটকে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সেটাকে নদী থেকে বের করতে পারলো না। জেলখানা থেকে সমস্ত কয়েদীকে ডেকে আনলো, যেন সবাই মিলে জাহাজটি বের করার চেষ্টা করে। চার হাজারের মত কয়েদী আপ্রাণ চেষ্টা করেও জাহাজকে সরাতে পারলো না। তখন তারা বাদশাহের কাছে দিয়ে বললেন, জেলখানায় যে সব মুসলমান কয়েদী আছে, ওদেরকে বলতে পারেন, হয়তো ওরা জাহাজ সরাতে পারবে। তবে শর্ত হচ্ছে, ওরা সে শ্লোগান দেবে, সেটা থেকে বাঁধা দেয়া যাবে না।

বাদশাহ এ শর্ত মেনে নিয়ে সব মুসলমান কয়েদীকে ছেড়ে গিয়ে বললো, তোমরা তোমাদের খুশী মতো যে শ্লোগান দিতে চাও, সেটা দিয়ে জাহাজটা বের করে আনো। সেই দ্বীনদার ব্যক্তিটি বলেন, আমরা সবাই মিলে চারশ মত ছিলাম। আমরা এক সাথে নারায়ে রেসালতের শ্লোগান দিলাম এবং এক আওয়াজে ইয়া রসূলল্লাহ বলে যখন জাহাজকে ধাক্কা দিলাম, তখন জাহাজ নড়ে উঠলো। এ শ্লোগান দিয়ে জাহাজকে আর থামতে দি নাই। একেবারে নদী থেকে বের করে দিয়েছি। (শওয়াহেদুল হক ১৬৩ পৃঃ)

সবক ঃ নারায়ে রেসালত মুসলমানদের প্রিয় শ্লোগান। মুসলমানগণ যেন এটাকে সদা প্রচলিত রাখে। এ পবিত্র নাম দ্বারা বড় বড় মুশকিল আসান হয়ে যায়। যে ব্যক্তি নারায়ে রেসালতের বিরোধীতা করে, ওর থেকে বড় জাহিল আর কেউ হতে পারে না।

কাহিনী নং- ৫১

এক সৈয়দজাদী ও এক অগ্নিউপাসক

সমরকন্দে এক বিধবা সৈয়দজাদী বাস করতেন। তাঁর কয়েকজন সন্তান ছিল। একদিন সে তাঁর ক্ষুধার্ত সন্তানদেরকে নিয়ে এক মুসলিম নেতার কাছে গেলেন এবং ওকে বললেন, আমি সৈয়দজাদী, আমার সন্তানগুলো উপবাস। ওদেরকে কিছু খেতে দিন। ধনদৌলতের মোহে বিভোর নাম সর্বস্ব সেই মুসলিমনেতা বললো, তুমি যদি সত্যিকার সৈয়দজাদী হও, তাহলে কোন প্রমান দেখাও। সৈয়দজাদী বললেন, আমি একজন গরীব বিধবা মহিলা, আমার কথা বিশ্বাস করুন, কি দলীল পেশ করবো? নেতা বললো, মুখের কথা বিশ্বাস করি না। দলীল দিতে না পারলে চলে যাও। সৈয়দজাদী সন্তানদেরকে নিয়ে ফিরে গেলেন এবং এক অগ্নিউপাসক নেতার কাছে গেলেন এবং তাঁর দুঃখের কথা শুনালেন। অগ্নি উপাসক বললো, মোহতরেমা, যদিওবা আমি মুসলমান নই, কিন্তু আপনার সৈয়দ বংশকে সম্মান করি। আসুন, আমার এখানে অবস্থান করুন, আমি আপানার রুটি কাপড়ের জিম্মাদার হলাম। এ বলে সে ওদেরকে স্বীয় ঘরে স্থান দিল, আর সন্তানদেরকে খাওয়ালো এবং খুবই আদরযত্ন করলো। দিবাগত রাতে সেই নাম সর্বস্ব মুসলমান নেতা স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে দেখলো যে, তিনি এক বিরাট নূরানী মহলের পাশে তশরীফ রেখেছেন। নেতাজি জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রসূলল্লাহ! এ নূরানী মহল কার জন্য? হুযূর ফরমালেন, মুসলমানের জন্য। সে বললো, হুযূর, আমি তো মুসলমান, এটা আমাকে প্রদান করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, তুমি যদি মুসলামন হও, তাহলে তোমার ইসলামের কোন প্রমাণ পেশ কর। নেতাজি এটা শুনে ভীষণ ঘাবড়িয়ে গেল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু

আলাইহে ওয়াসাল্লাম) ফরমালেন, আমার সৈয়দজাদী তোমার কাছে গেলে তুমি ওর কাছে সৈয়দের দলীল চেয়েছ আর নিজে বিনা দলীলে এ মহলে প্রবেশ করতে চাও, তা কিছুতেই সম্ভব নয়। এরপর ওর ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং খুবই কান্নাকাটি করলো। অতঃপর সেই সৈয়দজাদীকে খুঁজতে বের হলো। সে খবর পেল যে সৈয়দজাদী অমুক অগ্নিউপাসকের ঘরে আশ্রয় নিয়েছেন। নেতাজি সেই অগ্নি উপাসকের কাছে গিয়ে বললো, আমার থেকে এক হাজার দেরহাম গ্রহণ কর এবং সৈয়দজাদীকে আমার কাছে হস্তান্তর কর। অগ্নি উপাসক বললো, আমি কি সেই নুরুনী মহলটি এক হাজার টাকায় বিক্রি করে দিব? কক্ষনো নয়। শুনুন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে যেই নুরানী মহল থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তিনি আমাকেও স্বপ্নে দেখা দিয়ে কলেমা পড়ায়ে সেই নুরানী মহলে প্রবেশ করায়ে গেছেন। এখন আমিও স্ত্রী সন্তানসহ মুসলমান এবং হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আমাকে সুসংবাদ দিয়ে গেছেন যে- তুমি স্ত্রী-সন্তানসহ জান্নাতী। (নজহাতুল মাসালিস ১৯৪ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ দলীল তলবকারী নাম সর্বস্ব মুসলমান জান্নাত থেকে বঞ্চিত হলো এবং বিনা দলীলে রসূলের বংশধরের সম্মানকারী অগ্নিউপাসক ঈমান আনয়নে ধন্য হয়ে জান্নাত পেয়ে গেল। রসূলের আদব ও সম্মানের ব্যাপারে কথায় কথায় যারা দলীল তলব করে, তারা নাম সর্বস্ব মুসলমান।

কাহিনী নং- ৫২

আবদুল্লাহ বিন মুবারক ও এক সৈয়দজাদা

হযরত আবদুল্লাহ বিন মোবারক (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এক বড় সমাবেশ করে মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন, তখন এক সৈয়দজাদা ওনাকে বললেন, হে আবদল্লাহ! এটা কেমন সমাবেশ? দেখুন আমি রসূলের আওলাদ এবং আপনার বাপতো এরকম ছিল না। হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক জবাব দিলেন, আমি ঐ কাজ করছি, যা আপনার নানা জান করতেন এবং আপনি করতেছেন না। তিনি আরও বললেন, নিশ্চয় আপনি সৈয়দ এবং রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর বংশধর। এটাও সত্য যে আমার পিতা এ রকম ছিলেন না কিন্তু আপনার পিতা থেকে প্রাপ্ত ইলমের উত্তরাধিকারী হয়ে আমি প্রিয় পাত্র ও বুজুর্গ হয়ে গেছি। আর আপনি আমার পিতার উত্তরাধিকার গ্রহণ করে সম্মান লাভ করতে পারলেন না।

সেই রাতেই হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারক স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কে দেখলেন, তাঁর চেহেরা মুবারক মলিন ছিল। তিনি আরয করলেন, ইয়া রসূলল্লাহ!

আপনার চেহারা মুবারক মলিন কেন? ফরমালেন, তুমি আমার এক সন্তানের বেলায় কটাক্ষ করেছ। আবদুল্লাহ বিন মুবারক ঘুম থেকে উঠে সেই সৈয়দজাদার সন্ধানে বের হলেন যেন ওনার থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারেন। এদিকে সেই সৈয়দজাদাও সেই রাত্রে স্বপ্নে হুযূরকে দেখলেন। হুযূর ওকে বলেছেন, বেটা, তুমি যদি ভাল হতে, তাহলে তোমাকে এ রকম কথা বলতো না। সৈয়দজাদাও ঘুম থেকে উঠে হযরত আবদুল্লাহ বিন মুবারকের সন্ধানে বের হলেন। উভয়ের সাক্ষাত হলো এবং উভয়ের নিজ নিজ স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করে একে অপরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া ৭৩ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) উম্মতের প্রতিটি বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। হুযূরের সাথে সম্পর্কিত কোন বিষয়ে কটাক্ষ করা হুযূরের কাছে খুবই অপছন্দ।

কাহিনী নং- ৫৩

হযরত আবুল হাসান খরকানী ও দরসে হাদীছ

হযরত আবুল হাসান খরকানী (রহমতুল্লাহে আলাইহি) এর কাছে এক ব্যক্তি ইলমে হাদীছ পড়ার জন্য এসে ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি হাদীছ কার কাছে পড়েছেন? হযরত খরকানী বললেন, আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর কাছে হাদীছ পড়েছি। লোকটির বিশ্বাস হলো না। রাত্রে যখন শুইলেন স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) তশরীফ আনলেন এবং ফরমালেন, আবুল হাসান সত্য বলেছে, আমিই ওকে পড়ায়েছি। সকালে সে আবুল হাসানের খেদমতে হাজির হয়ে হাদীছ পড়তে লাগলেন, কতেক জায়গায় হযরত আবুল হাসন বলেন, এ হাদীছ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত নয়। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন? তিনি বললেন, তুমি যখন হাদীছ পড়তে শুরু করেছ তখন আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর ভ্রু মুবারক দেখতে লাগলাম। আমার এ চোখদ্বয় হুযূরের ভ্রু মুবারকের উপর নিবিষ্ট রয়েছে। যখন হুযূরের ভ্রু মুবারক কুঁচকে যায়, তখন আমি বুঝে ফেলি যে, হুযূর এ হাদীছকে অস্বীকার করছেন। (তাজাকিরাতুল আওলিয়া ৪৭৬ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) জীবিত এবং হাজির নাজির।

নেক্‌কার বান্দাগণ এখনও হুযূরের দীদার লাভ করে থাকেন। যে হুযূরকে জীবিত স্বীকার করে না, যে নিজেই মৃত।

কাহিনী নং- ৫৪

এক অলী ও এক মুহাদ্দিছ

এক অলী, এক মুহাদ্দিসের দরসে হাদীছে উপস্থিত ছিলেন, মুহাদ্দিছ সাহেব একটি হাদীছ পড়লেন, এবং বললেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এ রকম ফরমায়েছেন। তখন সেই অলী বললেন, এ হাদীছ বাতিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) কখনো এ রকম বলেননি। মুহাদ্দিছ সাহেব বললেন, আপনি এ রকম কেন বলছেন? তখন ওলী এ জবাব দিলেন ঃ

هٰذَا النَّبِى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفٌ عَلٰى رَاسِكَ يَقُوْلُ اِنِّى لَمْ اَقُلْ هٰذَا الْحَدِيْثَ.

দেখুন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) আপনার মাথার উপর অবস্থান করছেন এবং বলছেন, আমি কক্ষনো এ হাদীছ বর্ণনা করিনি।

মুহাদ্দিছ সাহেব এ কথায় বিস্মিত হয়ে গেলেন। ওলী তখন বললেন, আপনিও কি হুযূরকে দেখতে চান, তাহলে দেখে নিন। মুহাদ্দিছ সাহেব যখন উপরের দিকে তাকালেন, তখন হুযূরকে উপবেশন করা অবস্থায় দেখলেন। (ফত্ওয়ায়ে হাদীছিয়া ২১২ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের হুযূর হাজির নাজির। কিন্তু দেখার জন্য অলীর দৃষ্টি দরকার। কোন ওলীয়ে কামিলের সন্তুষ্টি লাভ করতে পারলে এখনও হুযূরের দীদার লাভ করা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

আম্বিয়ায়ে কিরামের কাহিনী

কাহিনী নং- ৫৫

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও ইবলিস

আল্লাহ তাআলা ফিরিশতাগণের মধ্যে যখন ঘোষণা করলেন যে, আমি পৃথিবীতে আমার

এক খলিফা সৃষ্টি করার মনস্থ করেছি। তখন অভিশপ্ত শয়তান এটাকে খুবই খারাপ মনে করলো এবং মনে মনে হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলো।

অতঃপর যখন আল্লাহ তাআলা হযরত আদম (আলাইহিস সালাম)কে সৃষ্টি করে ফিরিশতাগণকে নির্দেশ দিলেন আমার খলিফার সামনে মাথানত কর তখন সবাই মাথানত করলেন কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান অটল রইলো, মাথানত করলো না। ওর এ অহমিকা আল্লাহর কাছে পছন্দ হলো না। ওকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ইবলিস, আমি যখন আমার কুদরতী হস্তে সৃষ্ট খলিফার সামনে মাথানত করার নির্দেশ দিলাম, তখন তুমি কেন মাথানত করলে না? শয়তান জবাব দিল, আমি আদম থেকে উত্তম। কেননা আমি আগুনের সৃষ্টি এবং সে মাটির সৃষ্টি। তাছাড়া একজন মানুষকে আমি কেন সিজদা করবো? আল্লাহ তাআলা ওর এ ঔদ্বত্যপূর্ণ জবাব শুনার পর ফরমালেন, মরদুদ, আমার রহমতের বারগাহ থেকে বের হয়ে যা, তুই কিয়ামত পর্যন্ত বহিস্কৃত ও অভিশপ্ত। (কুরআন করীম সূরা বাকারা)

সবক ঃ আল্লাহর রসূল ও তাঁর মকবুল বান্দাদের ইজ্জত ও তাজীম করার দ্বারা আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। ওনাদেরকে নিজেদের মত মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করাটা শয়তানী কাজ। একজন নবীকে সর্বপ্রথম অবজ্ঞামূলক বশর (মানুষ) সম্বোধনকারী হলো শয়তান।

কাহিনী নং- ৫৬

শয়তানের থুথু

আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আলাইহিস সালামের দেহ মুবারক তৈরী করলেন, তখন ফিরিশতাগণ এটা দেখতে লাগলেন। কিন্তু অভিশপ্ত শয়তান হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলো এবং হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) এর দেহ মুবারকের উপর থুথু নিক্ষেপ করলো, এ থুথু গিয়ে পড়লো নাভিস্থলে। আল্লাহ তাআলা হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে নির্দেশ দিলেন, ঐ জায়গা থেকে থুথু মিশ্রিত মাটিগুলো বের করে ফেল এবং সেটা দ্বারা কুকুর বানিয়ে দাও। নির্দেশ মুতাবেক শয়তানের থুথু মিশ্রিত সেই মাটি দ্বারা কুকুর সৃষ্টি করা হলো। কুকুর মানুষের ভক্ত এ জন্য যে, এর শরীরে আদমের মাটি রয়েছে। নাপাক এ জন্য যে, সেই মাটি শয়তানের থুথু মিশ্রিত এবং রাত্রি জাগরণের কারণ হলো, সেই মাটিতে জিব্রাইলের হাত লেগেছে। (রুহুল বয়ান ৬০০ পৃঃ ১ম জিঃ)

সবক ঃ শয়তানের থুথু দ্বারা আদম আলাইহিস সালামের কোন ক্ষতি হয়নি। ববং নাভিস্থল পেটের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। এ রকম আল্লাহর নেক বান্দাদের বারগাহে বেআদবী করার দ্বারা ওনাদের কোন ক্ষতি হয় না। বরং ওনাদের শান আরও উদ্ভাসিত হয়। নেক্‌কার বান্দাদেরকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখাটা হচ্ছে শয়তানী কাজ।

কাহিনী নং - ৫৭

হযরত আদম আলাইহিস সালাম ও বনের হরিণ

হযরত আদম আলাইহিস সালাম যখন জান্নাত থেকে পৃথিবীতে তশরীফ আনলেন, তখন পৃথিবীর বিভিন্ন পশু তাঁকে দেখার জন্য ভীড় জমালো। তিনি প্রত্যেক পশুর জন্য ওদের উপযুক্ত দুআ করলেন। বনের কিছু হরিণও তাঁকে সালাম করা ও দেখার উদ্দেশ্যে হাজির হলো। তিনি স্বীয় হাত মুবারক ওদের পিঠের উপর বুলিয়ে দিলেন এবং ওদের জন্য দুআ করলেন। এতে ওদের নাভিতে মেশকের সুগন্ধি সৃষ্টি হয়ে গেল। এরা সুগন্ধির এ তোহফা নিয়ে যখন তাদের স্বজাতির কাছে ফিরে গেল, তখন প্রত্যেকে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, তোমারা এ সুগন্ধি কোথা থেকে নিয়ে আসলে? ওরা বললো, আল্লাহর নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম পৃথিবীতে তশরীফ এনেছেন, আমরা ওনাকে দেখতে গিয়েছিলাম। উনি রহমতে ভরপুর স্বীয় হাত মুবারক আমাদের পিঠের উপর বুলিয়ে দিয়েছেন। এতে এ সুগন্ধি সৃষ্টি হয়েছে। তখন অপরাপর হরিণেরা বললো, তাহলে আমাদেরকেও যেতে হয়। এ বলে ওরাও গেল এবং [illegible] আদম আলাইহিস সালাম ওদের পিঠের উপরও হাত বুলিয়ে দিলেন, কিন্তু ওদের মধ্যে সেই সুগন্ধি সৃষ্টি হলো না, ওরা যে রকম গেল, সে রকম ফিরে আসলো এবং আশ্চর্য হয়ে বললো, কি ব্যাপার! তোমরা গেলে সুগন্ধি পেলে আর আমরা গেলাম কিছুই গেলাম না। তখন ওরা উত্তর দিল, দেখ, আমরা গিয়েছিলাম কেবল সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কিন্তু তোমাদের উদ্দেশ্য শুদ্ধ ছিল না। (নজহাতুল মাজালিস-৪পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নেকবান্দাদের দরবারে নেক নিয়তে হাজির হলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। যদি কোন বদবখত তথায় গিয়ে কিছু না পায়, তাহলে সেটা ওর নিয়তের দোষ। এতে নেকবান্দাদের কোন দোষ নেই।

কাহিনী নং- ৫৮

নূহ আলাইহিস সালামের কিশ্‌তী

হযরত নূহ আলাইহিস সালমের কউম বড় পাপিষ্ঠ ও অপরিনামদর্শী ছিল। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়শ বছর দিনরাত সত্যের প্রচার করা সত্ত্বেও ওদেরকে

সৎপথে আনতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত উনি ওদের ধ্বংসের জন্য আল্লাহর কাছে এ বলে প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! ওদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দাও। তাঁর এ বদদুআ কবুল হলো এবং আল্লাহ তাঁকে নির্দেশ দিলেন, হে নূহ! আমি এক ভয়ংকর জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করবো এবং ওসব কাফিরদেরকে ধ্বংস করে দিব। তুমি নিজের জন্য এবং তোমার মুষ্টিমেয় অনুসারীদের জন্য একটি কিশ্‌তী তৈরী করে নাও।

নির্দেশ মুতাবেক হযরত নূহ আলাইহিস সালাম জংগলে গিয়ে কিশ্‌তী তৈরী করতে শুরু করলেন। কাফিরেরা তাঁকে দেখতো ও জিজ্ঞেস করতো, হে নূহ, কি করতেছ? তিনি বললেন, এমন এক ঘর তৈরী করছি, যেটা পানির উপর চলতে পারে। কাফিরেরা এ উত্তর শুনে হাসতো ও মসকরা করতো। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বলতেন, আজ তোমরা হাসতেছ কিন্তু এমন একদিন আসবে যেদিন আমি তোমাদেরকে দেখে হাসবো। হযরত নূহ আলাইহিস সালামের এ কিশ্‌তী তৈরী করতে দু'বছর সময় লেগেছিল। এর দৈর্ঘ্য ছিল তিনশ গজ, প্রস্থ পঞ্চাশ গজ এবং উচ্চতা ছিল ত্রিশ গজ। এ কিশ্‌তী তিন তলা বিশিষ্ট বানানো হয়েছিল। নিচের তলায় হিংস্র জীবজন্তু, মধ্যম তলায় চতুষ্পদ জন্তু ইত্যাদি এবং উপর তলায় স্বয়ং হযরত নূহ আলাইহিস সালাম, তাঁর অনুসারীগণ এবং খাদ্য সামগ্রী ছিল। বিভিন্ন পাখীও উপর তলায় ছিল। যখন আল্লাহর হুকুমে ভয়াল জলোচ্ছ্বাস হলো, তখন কিশ্‌তীর আরোহীরা ব্যতীত দুনিয়ার বুকে যারা ছিল, সবাই ডুবে মারা গেল। এমনকি নূহ আলাইহিস সালামের পুত্র কেনানও, যে কাফির ছিল, সেই মহা প্লাবনে ডুবে গিয়েছিল। (কুরআন করীম সূরা হুদ, খাযায়েনুল এরফান ৩৩০ পৃঃ)

সবক ঃ খোদা তাআলার নাফরমানী দ্বারা এ পৃথিবীতেও অধঃপতন ও ধ্বংসের শিকার হতে হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসুলের আনুগত্যের দ্বারা উভয় জাহানে নাজাত ও কল্যাণ পাওয়া যায়।

কাহিনী নং- ৫৯

নূহ আলাইহিস সালামের প্লাবন ও এক বৃদ্ধা

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম যখন আল্লাহর নির্দেশে কিশ্‌তী বানাতে শুরু করলেন, তখন এক মুমিন বৃদ্ধা নূহ আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এ কিশ্‌তী কেন তৈরী করতেছেন? তিনি বললেন, এক মহা প্লাবন হবে, সেটায় সব কাফির ডুবে মারা যাবে এবং মুমিনগণ এ কিশ্‌তীর বদৌলতে বেঁচে যাবে। বুড়ী আরয করলো, হুযূর

যখন তুফান আসার সময় হবে, তখন আমাকে খবর দিবেন যেন আমিও কিশ্‌তীতে আরোহন করত পারি। বুড়ীর কুড়ে ঘর শহর থেকে কিছু দূরে ছিল। তাই নূহ আলাইহিস সালাম অন্যান্য লোকদেরকে কিশ্‌তীতে উঠাতে ব্যস্ত হয়ে যাওয়ায় বুড়ির কথা মোটেই স্মরণ ছিল না। শেষ পর্যন্ত মহাপ্লাবনের আকৃতিতে আল্লাহর ভয়ানক আজাব অবতীর্ণ হলো, পৃথিবীর সব কাফির ধ্বংস হয়ে গেল। অতঃপর যখন এ আজাব বন্ধ হলো, পানি সরে গেল এবং কিশ্‌তীর আরোহীগণ কিশতী থেকে নেমে আসলো, তখন সেই বুড়ী হযরত নূহ আলাইহিস সালামের কাছে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হুযূর সেই মহা প্লাবন কবে আসবে? আমি প্রতি দিন এ অপেক্ষায় আছি যে, কখন আপনি কিশ্‌তীতে আরোহন করার জন্য বলবেন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম বললেন, মহাপ্লাবন তো হয়ে গেছে এবং সব কাফির ধ্বংস হয়ে গেছে। কিশ্‌তীর বদৌলতে আল্লাহ তাআলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে রক্ষা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তুমি কিভাবে জীবিত রইলে? আরয করলো, ব্যাপার বুঝে গেছি। যে খোদা আপনাকে কিশতীর বদৌলতে রক্ষা করেছেন, আমাকে আমার কূড়ে ঘরের বদৌলতে রক্ষা করেছেন। (রুহুল বয়ান ৮৫ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ যে খোদার হয়ে যায়, খোদা যেকোন অবস্থায় ওর সাহায্য করেন। বাহ্যিক কোন উসীলা ছাড়াও ওর কাজ হয়ে যায়।

কাহিনী নং - ৬০

হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম ও আল্লাহর কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন

ইসরাইল বংশের লোকেরা যখন আল্লাহর নাফরমানীতে সীমা অতিক্রম করলো, তখন আল্লাহ তাআলা বখতে নছর নামে এক জালিম বাদশাহকে ওদের উপর চাপিয়ে দিলেন। সে বনী ইসরাইলীদেরকে হত্যা, গ্রেপ্তার ও উৎখাত করলো এবং বায়তুল মুকাদ্দাসকে ধ্বংস ও ধুলিসাৎ করেদিল। হযরত ওযাইর আলাইহিস সালাম একদিন শহরে এসে দেখলেন যে শহর বিরান হয়ে গেছে। সারা শহরে কোন লোকজন দেখা গেল না। শহরের সমস্ত ইমারত বিধ্বস্ত দেখলেন। এ দৃশ্য দেখে তিনি ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন -

أَنّٰى يُحْىِ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا.

এ মৃত শহরকে আল্লাহ পুনরায় কিভাবে জীবিত করবেন!

তিনি এক গাধার উপর উপবিষ্ট ছিলেন এবং তাঁর কাছে এক বরতন খেজুর ও এক

পেয়ালা আঙ্গুরের রস ছিল। তিনি তাঁর গাধাকে এক বৃক্ষের সাথে বেঁধে তিনি সেই বৃক্ষের নিচে ঘুমায়ে পড়লেন। এ ঘুমন্তাবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর রূহ কবজ করলেন। গাধাটাও মারা গেল। এ ঘটনার সত্তর বছর পর আল্লাহ তাআলা পারস্যের এক বাদশাহকে তথায় রাজত্ব দান করলেন। সে সৈন্য সমস্ত নিয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস এসে একে আগের থেকেও উত্তম ডিজাইনে গড়ে তুললেন। বনী ইসরাইলের মধ্যে যারা জীবিত ছিল, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় এখানে আনলেন এবং তারা বায়তুল মুকাদ্দস ও এর আশে পাশে বসতি স্থাপন করলো, ক্রমান্বয়ে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগালো।

আল্লাহ তাআলা হযরত ওযাইর আলাইহিস সালামকে দুনিয়াবাসীর দৃষ্টির আড়ালে রেখেছিলেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেল না। যখন তাঁর ওফাতের শত বছর অতিবাহিত হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে দ্বিতীয়বার জীবিত করলেন। যে সময় তিনি ঘুমায়ে ছিলেন, তখন সকাল বেলা ছিল এবং একশ বছর পর যখন তাঁকে পুনরায় জীবিত করা হলো, তখন সন্ধ্যা বেলা ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে ওযাইর তুমি এখানে কতক্ষণ অবস্থান করলে? তিনি অনুমান করে বললেন, একদিন বা এর কিছু কম হতে পারে। তিনি মনে করেছিলেন, এ সন্ধ্যাটা সেই দিনের, যে দিনের সকালে তিনি শুয়েছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি এখানে একশ বছর অবস্থান করেছ, তোমার খাবার ও পানি অর্থাৎ খেজুর ও আঙ্গুরের রস দেখ, অবিকলই রয়েছে। এতে কোন গন্ধও হয়নি। তোমার গাধাকেও দেখ, সেটা মরে পঁচে গলে গিয়েছে। অংগ প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে এবং হাডিডগুলো সাদা হয়ে চমকাচ্ছে। তাঁর সামনেই আল্লাহ তাআলা সেই গাধাকেও জীবিত করলেন। প্রথমে এর অংগ প্রত্যংগ গুলো একত্রিত হয়ে যথাস্থানে স্থাপিত হলো, হাড্ডি গুলোর উপর মাংসের প্রলেপ হলো, মাংসের উপর চামড়া সৃষ্টি হলো, চামড়ার উপর পশম গজালো, অতঃপর এতে প্রাণের সঞ্চার হলো এবং দেখতে দেখতে সেটা উঠে দাঁড়ালো এবং আওয়াজ করতে লাগলো। তিনি আল্লাহ তাআলার এ কুদরত দেখে বললেন, আমি জানি এবং বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। এরপর তিনি স্বীয় বাহনের উপর আরোহন করে নিজ মহল্লার দিকে আসলেন। কেউ তাঁকে চিনলো না। অনুমান করে তিনি স্বীয় ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর বয়স সেই চল্লিশ বছরই ছিল। তাঁর ঘরের সামনে এক দুর্বল বৃদ্ধাকে দেখলেন, যার পাদ্বয় ছিল অবশ এবং চক্ষুদ্বয় ছিল দৃষ্টিহীন। সে ছিল তাঁর ঘরের বাদী এবং সে তাঁকে দেখেছিল। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ওযাইরের ঘর? সে বললো, হ্যাঁ, কিন্তু ওযাইর তো একশ বছর

আগে লাপাত্তা হয়ে গেছে। এ বলে সে খুবই কান্নাকাটি করলো। তিনি বললেন, আমি ওযাইর, আল্লাহ তাআলা আমাকে একশ বছর মৃত রেখেছিলেন, পুনরায় জীবিত করেছেন। বৃদ্ধা বললো, ওযাইর তো মুস্তাজা বুদ দাওয়াত দিলেন। অর্থাৎ ওনার দুআ বিফল হতো না, যে দুআ করতেন, সেটা কবুল হয়ে যেত। আপনি যদি ওযাইর হয়ে থাকেন, তাহলে আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসার জন্য দুআ করুন যেন আমি নিজের চোখে আপনাকে দেখি।

তিনি দুআ করার সাথে সাথে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। অতঃপর তিনি ওর হাত ধরে বললেন আল্লাহর হুকুমে দাঁড়াও। এটা বলার সাথে সাথে পাদ্বয়ও সচল হয়ে গেল। সে তাঁকে দেখে চিনতে পারলো এবং বললো, আমি দৃঢ় ভাবে বলছি, আপনি নিশ্চয়ই ওযাইর। এরপর সে তাঁকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। তখন ঘরে এক বৈঠক চলছিল, উক্ত বৈঠকে তাঁর এক সন্তানও ছিলেন। যার বয়স হয়েছিল একশ আঠার। উক্ত বৈঠকে তাঁর কয়েকজন নাতিও ছিলেন তাঁরাও বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বৃদ্ধা সেখানে গিয়ে বললেন, এ দেখুন, হযরত ওযাইর এসেছেন। উপস্থিত সবাই বললেন, কিছুতেই হতে পারে না। বৃদ্ধা বললো, আমার দিকে তাকান, আমি তাঁর দুআর বদৌলতে একেবারে সুস্থ ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন হয়ে গেছি। তখন ওনারা সবাই তাঁর কাছে আসলেন এবং তাঁর বড় ছেলে বললেন, আমার আব্বাজানের দু'কাধেঁর মাঝখানে নতুন চাঁদের আকৃতিতে কাল পশম ছিল। কাপড় খুলে দেখা গেল যে ঠিকই সেটা মওজুদ আছে। (কুরআন করীম ৩ পারা ৩ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৬৫ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর একটি পরিনাম এটাও যে, ওদের উপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেয়া হয় এবং দেশ ধ্বংস হয়ে যায়। আল্লাহ তাআলা বড় কুদরতের মালিক, তিনি যা চায় তা করতে পারেন। এক দিন সবাইকে জীবিত করে তাঁর দরবারে ডাকবেন এবং কৃতকর্মের হিসেব নিবেন। নবীর শরীর মৃত্যুর পরেও অবিকল থাকে। তবে যে গাধা, সে মরে মাঠির সাথে মিশে যায় এবং মাঠি হয়ে যায়।

কাহিনী নং-৬১

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ও চারটি পাখী

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম একদিন সমুদ্রের কিনারে একটি মরা মানুষ দেখলেন। তিনি দেখলেন যে সমুদ্রের মৎস্যকূল লাশটি খাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল যে কয়েকটি পাখী এসে লাশটি খেতে লাগলো। এর কিছুক্ষন পর আবার দেখা

গেল যে বনের কিছু হিংস্র প্রাণী এসে সেই লাশটি খেতে লাগলো। তিনি এ দৃশ্য দেখে তাঁর মনে মৃতকে জীবিত করার দৃশ্যটা দেখার দরুন আগ্রহ সৃষ্টি হয়। অতএব তিনি আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আমার বিশ্বাস আছে যে আপনি মৃতদেরকে জীবিত করবেন এবং ওদের অংগ প্রত্যংগ সামুদ্রিক প্রাণী, পশু পাখীর পেট থেকে সংগ্রহ করবেন। কিন্তু আমি এ আজব দৃশ্য দেখার জন্য একান্ত আরজু করছি। আল্লাহ তাআলা ফরমাল্লেন, হে খলীল, ঠিক আছে, তুমি চারিটি পাখী নিয়ে নিজের কাছে রেখো, যাতে এগুলোকে ভাল মতে চিনতে পার। অতঃপর এগুলোকে জবেহ করে এগুলোর অংগপ্রত্যংগগুলো একত্রে মিশায়ে ওগুলোর এক এক অংশ এক এক পাহাড়ে রেখে দাও এবং ওগুলোকে আহবান কর। তখন দেখবে, ওগুলো কিভাবে জীবিত হয়ে তোমার কাছে দৌড়ায়ে আসবে।

সে মতে হযরত ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) একটি ময়ূর, একটি কবুতর, একটি মোরগ ও একটি কাক-এ চারটি পাখী সংগ্রহ করে জবেহ করলেন। অতঃপর ওগুলোর পালক উঠায়ে ওগুলোকে ছোট ছোট টুকরা করে সব মিশায়ে কয়েক ভাগ করে এক এক ভাগ এক এক পাহাড়ে রেখে দিলেন এবং মাথাগুলো নিজের কাছে রাখবেন। অতঃপর তিনি বললেন, চলে এসো, তাঁর বলার সাথে সাথে ও সমস্ত মিশ্রিত অংশগুলো উড়ে এসে পূর্ববৎ পাখীর আকৃতি ধারণ করে স্বীয় পায়ে দৌড়ায়ে উপস্থিত হলো এবং নিজ নিজ মাথার সাথে সংযুক্ত হয়ে অবিকল আগের মত পূর্ণাঙ্গ পাখী হয়ে উড়ে গেল। (কুরআন করীম ৩ পারা, খাযায়েনুল এরফান ৬৬ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা বড় কুদরত ও শক্তির মালিক। কেউ ডুবে মারা গেল এবং ওকে মাছে খেয়ে ফেললো, বা কেউ আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল বা কাউকে পাখী এবং সামুদ্রিক মাছ অল্প অল্প করে খেয়ে ফেললো এবং ওর অংগ প্রত্যঙ্গ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল, আল্লাহ তাআলা এরপরও ওর সব কিছু সংগ্রহ করে নিশ্চয় জীবিত করবেন। আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার থেকে পালানোর কোন সুযোগ নেই। মৃতরা শুনে। তা নাহলে আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহীমকে এটা বলতেন না, টুকরা টুকরাকৃত পাখীগুলোকে ডাক। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে সেই মৃত পাখীগুলোকে ডাকলেন এবং সেই মৃত পাখীগুলো তাঁর আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসলো। এটা হলো পাখীর শ্রবন শক্তি কিন্তু যারা আল্লাহওয়ালা ওদের শ্রবন শক্তি কতটুকু হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ওসব পাখীগুলোকে জীবিত তো আল্লাহ তাআলা করেছেন, কিন্তু এ জিন্দেগী ওরা লাভ করেছে ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আহবান ও মুখ নাড়ার

দ্বারা। আল্লাহ ওয়ালাগণের মুখ নাড়াতেই আল্লাহ উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেন। এজন্য মুসলমানগণ আল্লাহ ওয়ালাগণের কাছে যায় যেন ওনাদের মুবারক ও অকাট্য দুআ দ্বারা মকচুদ পূর্ণ করেন।

কাহিনী নং- ৬২

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কুঠার

হযরত ইব্রাহীম আলাইসিস সালাম যখন জন্ম গ্রহণ করেন, তখন নমরুদের যুগ ছিল এবং মূর্তি পূজার খুবই প্রসার ছিল। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম একদিন ওসব অগ্নি উপাসকদের বললেন, তোমাদের এটা কি ধরণের আচরণ যে, এসব মূর্তিদের সামনে মাথানত করে থাক। এরা তো উপাসনার উপযুক্ত নয়। একমাত্র আল্লাহ তাআলাই উপসনার উপযোগী।

ওসব লোকেরা বললো, আমাদের বাপ-দাদাদের যুগ থেকে এ সব মূর্তিদের পূজা হয়ে আসতেছে। কিন্তু এখন তুমি এমন এক লোক সৃষ্টি হলে যে, ওসব মূর্তিদের পূজা থেকে বাঁধা দিচ্ছ।

তিনি বললেন, তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা সবাই গুমরাহ। আমি যা বলছি, তাই হচ্ছে হক কথা। তোমরা ও জমীন-আসমানের মধ্যে যা কিছু আছে, সবের প্রভু তিনি, যিনি এসবগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। জেনে রেখো, আমি খোদার কসম করে বলছি, তোমাদের এসব মূর্তিদেরকে আমি দেখে নিব।

ঠিকই একদিন যখন মূর্তি পূজারীরা সবাই তাদের বার্ষিক এক মেলা উপলক্ষে শহরের বাইরে জংগলে গেল, তখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম ওদের মূর্তিঘরে ঢুকে কুঠার দ্বারা সব মূর্তি ভেঙ্গে ফেললেন কিন্তু বড় মূর্তিটা ভাংলেন না, ওটার কাঁধের উপর কুঠারটা রেখে দিলেন।

ওরা মেলা থেকে ফিরে এসে মূর্তিঘরে গিয়ে দেখলো যে তাদের দেবতাদের বেহাল অবস্থা। কোনটা ভেঙ্গে চুরে পড়ে রয়েছে। কোনটার হাত নেই। কোনটার নাক নেই, কোনটার চোখ উপড়ায়ে ফেলা হয়েছে। কোনটার পা উদাও হয়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে তারা হতভম্ব হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো, কোন্ জালিম আমাদের দেবতাদের এ অবস্থা করলো?

এ খবর নমরুদ ও ওর উজির নাজিরদের কানে পৌঁছলো এবং সরকারীভাবে এর তদন্ত

হতে লাগলো। লোকেরা বললো, ইব্রাহীম এসব মূর্তিগুলোর বিরুদ্ধে অনেক কিছু বলে, মনে হয় সেই এ কাজ করেছে। সুতরাং হযরত ইব্রাহীমকে ডেকে জিজ্ঞেস করা হলো, আমাদের দেবতাদের সাথে এ আচরন কি তুমি করেছ? তিনি বললেন, ঐ যে বড় মূর্তিটা যেটার কাঁধে কুঠার রয়েছে তা দেখে অনুমান করা যায় যে, এটা কার কাজ। তাই আমাকে কেন জিজ্ঞেস করছ? ওকে জিজ্ঞেস করতে পার। ওরা বললো, সেটাতো কথা বলতে পারে না। এ সুযোগে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, যখন তোমরা নিজেরাই স্বীকার করতেছ যে, ওটা কথা বলতে পারে না, তাহলে ধিক্কার তোমরা অথর্বদের প্রতি ও তোমাদের দেবতাদের প্রতি, যাদের তোমরা পূজা কর। (কুরআন ১৭ পারা, ,৫ আয়াত)

সবক ঃ আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তি পূজা করা শিরক। কুরআন মজীদের যেখানে مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত) শব্দ আছে, ওখানে এ মুর্তিদের বুঝানো হয়েছে, নবীও ওলীগণকে বুঝানো হয়নি। এ জন্য ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম, ওগুলোর প্রতি ধিক্কার বলছেন। যদি مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ দ্বারা নবী ওলী বুঝানো হতো, তাহলে ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এ রকম বলতেন না।

কাহিনী নং- ৬৩

হযরত ইব্রাহীম খলীলের সাথে নমরুদের বিতর্ক

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম যখন নমরুদকে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আহবান জানালেন, তখন ইব্রাহীম ও নমরুদের মধ্যে নিম্নের বিতর্ক হয়েছিলঃ

নমরুদ ঃ কে তোমার আল্লাহ, যার ইবাদত করার জন্য তুমি আমাকে বলছ?

হযরত খলীল আলাইহিস সালাম ঃ তিনিই আমার আল্লাহ, যিনি জীবিতও করেন এবং মেরেও ফেলেন।

নমরুদ ঃ এ যোগ্যতাতো আমারও আছে। এখনই আমি জীবিত করে দেখাচ্ছি এবং মেরেও দেখাচ্ছি। এ বলে নমরুদ দুজন ব্যক্তিকে ডাকলো, ওদের একজনকে হত্যা করে ফেললো এবং অপরজনকে ছেড়ে দিল। অতঃপর বলতে লাগলো, দেখ, একজনকে আমি মেরে ফেলেছি এবং অপর জনকে গ্রেপ্তার করে ছেড়ে দিয়েছি, যেন ওকে জীবিত করে দিয়েছি। নমরুদের এ বোকামীপূর্ণ কথা শুনে হযরত ইব্রাহীম অন্যভাবে তর্ক শুরু করলেন। তিনি বললেন ঃ

হযরত খলীল আলাইহিস সালাম ঃ আমার আল্লাহ সূর্য পুর্ব দিক থেকে উদিত করেন। তোমার কাছে যদি কোন ক্ষমতা থাকে, তাহলে তুমি পশ্চিম দিক থেকে উদিত করে দেখাও।

একথা শুনে নমরুদের নাভিশ্বাস উঠলো এবং লা-জবাব হয়ে গেল। (কুরআন ৩ পারা ৩ আয়াত)

সবক ঃ মিথ্যা দাবীর পরিণতি হচ্ছে জিল্লতী ও অপদস্থ। কাফির চরম বোকা হয়ে থাকে।

কাহিনী নং-৬৪

নমরুদের অগ্নিকুন্ড

অভিশপ্ত নমরুদ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের বিরুদ্ধে বির্তকে যখন পরাজিত হলো, তখন আর কিছু করতে না পেরে হযরতের জানের দুশমন হয়ে গেল এবং তাঁকে বন্দী করে ফেললো, অতঃপর চার দেয়ালের এক কাঠামো তৈরী করে ওখানে নানা ধরনের লাকড়ীর স্তুপ করলো এবং আগুন জ্বালিয়ে দিল, যার উত্তাপে আকাশে উড়ন্ত পাখী জ্বলে যেত। এরপর একটি নিক্ষেপন হাতিয়ার তৈরী করলো, ওটার সাথে হযরত ইব্রাহীমকে বেঁধে আগুনে নিক্ষেপ করলো। হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের মুখে তখন এ কলেমা জারী ছিল। حَسْبِىَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি উত্তম কার্য নির্বাহক)

এদিকে নমরুদ হযরত ইব্রাহীমকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলো, ওদিকে আল্লাহ তাআলা আগুনকে নির্দেশ করলেন, হে আগুন, খবরদার! আমার খলীলকে জ্বালিওনা। তুমি আমার ইব্রাহীমের জন্য ঠান্ডা হয়ে যাও এবং নিরাপত্তার আবাসস্থল হয়ে যাও। ফলে সেই আগুন হযরত ইব্রাহীমের জন্য বাগানে পরিণত হয়ে গেল। (কুরআন ১৭ পারা, ৫ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৪৬৩ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণকে শক্ররা সব সময় কোনঠাসা করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওদের কোন ক্ষতি করতে পারে না ববং নিজেরাই নাজেহাল হয়ে থাকে।

কাহিনী নং-৬৫

হযরত ইব্রাহীম খলীল ও জিব্রাইল

নমরুদ যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করার মনস্থ করলো, তখন হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন, হুযূর! আল্লাহকে বলুন, তিনি যেন আপনাকে অগ্নিকুন্ড থেকে রক্ষা করেন। তিনি বললেন, নিছক শরীরের জন্য এত বড় মহা শক্তিশালী পবিত্র সত্তার কাছে এ সামান্য বিষয়ে প্রার্থনা করবো? হযরত জিব্রাইল আরয করলেন, তাহলে আপনার আত্মাকে রক্ষা করার জন্য বলুন। তিনি বললেন,এ আত্মা ওনার জন্য। তিনি নিজের জিনিসের সাথে যা ইচ্ছে আচরণ করতে পারেন। হযরত জিব্রাইল আরয করলেন, হুযূর! আপনি এত উত্তপ্ত আগুন থেকে কেন ভয় পাচ্ছেন না?

ফরমালেন, হে জিব্রাইল এ আগুন কে জ্বালালো? জিব্রাইল জবাব দিলেন, নমরুদ। তিনি ফরমালেন, নমরুদকে এ ধারণাটা কে দিলেন? জিব্রাইল জবাব দিলেন, মহান আল্লাহ। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে। একদিকে আল্লাহ জল্লা জলালুহুর নির্দেশ, অন্যদিকে ইব্রাহীম খলীলের রেজাবন্দী। (নযহাতুল মাজালিস- ১০৪ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালারা সব সময় আল্লাহর ইচ্ছায় সন্তুষ্ট থাকেন।

কাহিনী নং - ৬৬

হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালামের পরিশ্রম

হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একবার জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে জিব্রাইল! তোমাকে কি কোন সময় খুব দ্রুত গতিতে আসমান থেকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়েছিল? জিব্রাইল জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ইয়া রসূলুল্লাহ! চার বার এ রকম হয়েছে; খুবই দ্রুত গতিতে আমাকে পৃথিবীতে অবতরণ করতে হয়েছিল।

হুযূর ফরমালেন, কোন্ কোন্ অবস্থায় সেই চার বার অবতরণ করতে হয়েছিল ?

জিব্রাইল আরয করলেন, প্রথমবার, যখন হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন আমি আরশের নিচে ছিলাম। আমাকে আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, জিব্রাইল, আমার খলীল আগুনে পতিত হওয়ার আগে তুমি এক্ষুনি তথায় পৌছে যাও। তখন আমি খুবই দ্রুত গতিতে হযরত ইব্রাহীম আলাইসিস সালামের কাছে পৌছে গিয়েছিলাম।

দ্বিতীয়বার, যখন হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামের পবিত্র গলার উপর ছুরি বসানো হলো, তখন আমাকে নির্দেশ দেয়া হলো ছুরি চালনার আগে পৃথিবীতে পৌছে যাও এবং ছুরি উল্টায়ে দাও। নির্দেশমত আমি ছুরি চালনার আগে পৃথিবীতে পৌছে গিয়েছিলাম এবং ছুরি চালাতে দি নাই।

তৃতীয়বার, যখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ওনার ভাইয়েরা কূপে ফেলে দিলেন, তখন আমাকে হুকুম করা হলো, ইউসুফ আলাইহিস সালাম কুপের তলায় পৌছার আগেই যেন আমি পৃথিবীতে পৌছে যাই এবং কূপ থেকে একটি পাথর বের করে ওটার উপর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যেন আরামে বসায়ে দি। নির্দেশমত আমি সেরকমই করেছিলাম।

চতুর্থবার,ইয়া রসুলুল্লাহ! যখন কাফিরেরা আপনার দাঁত মুবারক শহীদ করলেন, তখন আমার প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো, আমি যেন এক্ষুনি পৃথিবীতে অবতরণ করি এবং হুযূরের দাত মুবারকের পবিত্র রক্ত যেন মাটিতে পড়ার আগেই স্বীয় হাতে নিয়েনি। ইয়া রসুলুল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেছিলেন, জিব্রাইল! আমার মাহবুবের এ রক্ত যদি মাটিতে পতিত হয়; তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন সবজি উৎপন্ন হবে না এবং কোন বৃক্ষ জন্মাবে না। তাই আমি খুবই দ্রুত গতিতে পৃথিবীতে পৌছেছি এবং হুযূরের পবিত্র রক্ত নিজ হাতে নিয়ে নিয়েছি। (রুহুল বয়ান ৪১১পৃঃ ৩ জিঃ)

সবক ঃ নবীগণের শান অনেক উর্ধে। জিব্রাইল আমীনও ওনাদের খাদেম। আল্লাহ ওয়ালারা কোটি কোটি মাইল দূরত্বের পথ এক পলকে অতিক্রম করতে পারেন।

কাহিনী নং- ৬৭

ছেলে কুরবানী

হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন, কোন ব্যক্তি অদৃশ্য থেকে আওয়াজ করে বলছে, হে ইব্রাহীম! আপনার উপর আল্লাহর নির্দেশ হয়েছে, নিজ সন্তানকে আল্লাহর রাস্তায় জবেহ করে দিন। যেহেতু নবীগণের স্বপ্ন সঠিক ও ওহী সদৃশ হয়ে থাকে, সেহেতু তিনি তাঁর প্রিয় সন্তান হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পথে কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন।

হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন বিধায় তাঁকে শুধু এতটুকু বলেছেন, বেটা, রশি ও ছুরি নিয়ে আমার সাথে চলো; এ বলে স্বীয় সন্তানকে নিয়ে

তিনিক জংগলে পৌঁছলেন। হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, আব্বাজান! আপনি এ ছুরি ও রশি নিয়ে কেন এসেছেন? তিনি ফরমালেন, সামনে গিয়ে একটি কুরবানী দিব।

কিছু দুর গিয়ে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সরাসরি বলে দিলেন, বেটা! আমি তোমাকেই আল্লাহর পথে জবেহ করার জন্য এখানে এসেছি। আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে জবেহ করতেছি। বেটা, এটা আল্লাহর ইচ্ছা। বল, তোমার ইচ্ছা কি? হযরত ইসমাঈল জবাব দিলেন ঃ

আব্বাজান, যখন এটা আল্লাহর ইচ্ছা, তখন আমার ইচ্ছার প্রশ্নই উঠে না। আপনার প্রতি যেটা নির্দেশ হয়েছে, সেটা পালন করুন। ইনশা আল্লাহ আমি ধৈর্য ধারণ করবো। ছেলের এ সাহসিকতাপূর্ণ জবাব শুনে হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং স্বীয় সন্তানকে আল্লাহ পথে জবেহ করার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন। পিতা যখন সন্তানকে শোয়ায়ে গলায় ছুরি চালালেন, তখন ছুরি হযরত ইসমাইলের গলা মোটেই কাটলো না। তিনি যখন আরও জোরে ছুরি চালাতে লাগলেন, তখন গায়েবী আওয়াজ আসলো-আর না হে ইব্রাহীম! তুমি আল্লাহর নির্দেশ পালন করেছ এবং এ কঠিন পরীক্ষায় পরিপূর্ণভাবে কামিয়াব হয়েছ। তিনি মাথা ফিরায়ে দেখলেন একটি দুম্বা পাশে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁকে বলছেন, জনাব ইসমাঈলের স্থলে আমাকে জবেহ করুন এবং ওনাকে সরিয়ে দিন। অতএব হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম সেই দুম্বাকে জবেহ করলেন এবং হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালাম উঠে বসলেন এবং মহা পরীক্ষায় বাপ-বেটা উভয়ে কামিয়াব হলেন। (কুরআন ২৩ পারা, ৭ আয়াত ও তফসীর গ্রন্থসমূহ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ আল্লাহর রাস্তায় সব কিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত থাকেন। এমনকি নিজ সন্তানকেও কুরবানী করতে দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু আজকাল যারা আল্লাহর রাস্তায় একটি ছাগল জবেহ করতে নানা রকম তালবাহনা করে, আল্লাহর সাথে তাদের কিবা সম্পর্ক?

ফেরাউনের স্বপ্ন

ফেরাউন একবার সপ্নে দেখল যে,ওর সিংহাসন উপুড় হয়ে পড়ে গেল। সে ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে এর তাবীর জিজ্ঞেস করলো। ওরা বললো, এমন এক শিশুর জন্ম

হবে, যে আপনার রাজত্বের পতনের কারণ হবে। ফেরাউন এ কথায় খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং নবজাতক নিধন করতে শুরু করলো। কারো ঘরে শিশু জন্ম হলেই নিধন করাতো। হযরত মূছা আলাইহিস সালাম যখন জন্ম নিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা মূছা আলাইহিস সালামের মায়ের মনে এ ধারণাটা দিলেন যে, ওকে দুধপান করাও এবং কোন বিপদ দেখলে ওকে নদীতে ফেলে দিও। সেমতে মূসা আলাইহিস সালামের মা কয়েক দিন দুধ পান করালেন। এ সময় তিনি কাঁদতেন না এবং কোলে নড়াছড়াও করতেন না এবং তাঁর বোন ছাড়া অন্য কেউ তাঁর জন্মের খবর জানতো না। এভাবে তিন মাস অতিবাহিত হবার পর মূসা আলাইহিস সালামের মা কিছুটা বিপদের আশংকা করলো। তখন আল্লাহ তাআলা ওনার মনে এ ধারণাটা দিলেন, এখন মূসা আলাইহিস সালামকে একটি সিন্দুকে ভরে সমুদ্রে ফেলে দাও এবং কোন চিন্তা করো না। আমি ওকে পুনরায় তোমার কোলে ফিরায়ে দেব। সে মতে একটি বড় সিন্দুক তৈরী করলেন এবং ওটাতে তুলা বিছায়ে এর উপর মূসা আলাইহিস সালামকে রেখে সিন্দুক বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর এ সিন্দুকটি নিল নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। এ নদীর একটি বড় শাখা ফেরাউনের শাহী মহলের পাশ দিয়ে প্রবাহমান ছিল। ফেরাউন স্বীয় বিবি আসিয়াকে সাথে নিয়ে নদীর তীরে বসা ছিল, এ সময় একটি সিন্দুক ভেসে আসতে দেখলো। তখন সে দাস-দাসীদেরকে সিন্দুকটি ধরার জন্য বললো। সিন্দুকটি ধরে তুলে উঠায়ে তার সামনে নিয়ে আসলো এবং খোলার পর দেখা গেল যে, যেখানে এক নূরানী আকৃতির শিশু রয়েছে, যার চেহারা মুবারকে সৌন্দর্য ও সৌভাগ্যের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছিল। দেখা মাত্রই ফেরাউনের মনে শিশুটির প্রতি দারুন মহব্বত সৃষ্টি হলো এবং খুবই আকৃষ্ট হয়ে পড়লো। কিন্তু ওর কউমের লোকেরা ওকে স্মরণ করায়ে দিল যে এটা সেই শিশুও হতে পারে, যে আপনার রাজত্ব ধ্বংস করে দিবে। এ কথা শুনে ফেরাউন ওকে হত্যার জন্য প্রস্তুত হলো। তখন ফেরাউনের স্ত্রী- বিবি আসিয়া, যিনি বড় নেক্কার মহিলা ছিলেন, বলতে লাগলেন-এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমনি। ওকে হত্যা কর না! এ কোন্ মুল্লুক থেকে ভেসে এসেছে তার কোন পাত্তা নেই। যে শিশুর বাপারে তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, সেটাতো এ দেশের বনী ইসরাইলের বংশোদ্ভুত বলা হয়েছে। আসিয়ার এ কথা ফেরাউন মেনে নিল এবং ফেরাউনের ঘরেই মূসা আলাইহিস সালাম লালিত পালিত হতে লাগলো। ওনাকে দুধ পান করানোর জন্য অনেক ধাত্রী আনা হলো। কিন্তু তিনি কারো দুধ পান করেন না। এতে ফেরাউন মহা চিন্তায় পড়লো, এমন একজন ধাত্রী পাওয়া যেত, যার দুধ পান করতো।

এদিকে মূসা আলাইহিস সালামের মা শিশুর বিচ্ছেদে অস্থির হয়ে পড়েছিলেন

এবং মূসা আলাইহিস সালামের বোন, যার নাম ছিল মরিয়াম, সিন্দুক কোথায় গেল, মূসা কার হাতে পড়লো, সেটার সন্ধানে ছিল। খোঁজ নিয়ে জানতে পারলো, মূসা একেবারে ফেরাউনের ঘরে পৌঁছে গেছে এবং ওখানে লালিত পালিত হচ্ছে। এটাও জানতে পারলো যে মূসা কোন ধাত্রীর দুধ পান করছেনা। সুযোগ বুঝে সে ফেরাউনের কাছে গিয়ে বললো, আমি আপনাকে এমন একজন ধাত্রীর খবর দিতে পারি, যার দুধ এ শিশু নিশ্চয় পান করবে। ফেরাউন বললো, নিশ্চয়ই, আমি তো এ রকম ধাত্রীর খোঁজে আছি। অতএব সে ফেরাউনের একান্ত আগ্রহে ওর মাকে ডেকে আনলো, মূসা আলাইহিস সালাম তখন ফেরাউনের কোলে ছিল এবং দুধ পান করার জন্য কাঁদছিলেন। ফেরাউন ওনাকে শান্ত করার জন্য চেষ্টা করছিল। মায়ের গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে শান্ত হয়ে গেলেন এবং মায়ের দুধ পান করতে লাগলেন। ফেরাউন জিজ্ঞেস করলো, তুমি এ শিশুর কে? কোন ধাত্রীর দুধ সে পান করলো না কিন্তু তোমারটা সাথে সাথে পান করলো। তিনি বললেন, আমি একজন পবিত্র মহিলা, আমার দুধ সুস্বাদু। যে সব শিশুর মানসিকতা পবিত্র হয়, ওরা অন্য মহিলাদের দুধ পান করে না, আমার দুধই পান করে। ফেরাউন শিশুটা ওকে দিয়ে দিল এবং ধাত্রী হিসেবে ওকে নিয়োগ করে শিশুকে ওর ঘরে নিয়ে যেতে অনুমতি দিল। সেমতে মূসা আলাইহিস সালামকে ঘরে নিয়ে আসলেন এবং আল্লাহ তাআলার সেই ওয়াদাটা পূর্ণ হয়ে গেল-'আমি ওকে তোমার কোলে ফিরিয়ে দেব'। এভাবে মূসা আলাইহিস সালামের লালন-পালন ফেরাউনেরই মাধ্যমে হতে লাগলো। দুধ পান করার সময় কালটা ওনার মায়ের কাছেই রইলেন এবং ফেরাউন পারিশ্রমিক হিসেবে প্রতিদিন একটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিতে থাকল। দুধ ছাড়ার পর মূসা আলাইহিস সালামকে ফেরাউনের রাজ প্রাসাদে নিয়ে আসলো এবং তথায় লালিত পালিত হতে লাগলো। (কুরআন করীম ১৬ পারা ১১ আয়াত, ২০ পারা ৪ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৪০৪, ৫৪৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা বড় কুদরত ও ক্ষমতার অধিকারী। মূসা আলাইহিস সালামকে স্বয়ং ফেরাউনের ঘরে রেখেই লালন পালনের ব্যবস্থা করলেন। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর শৈশবে অন্য কোন ধাত্রীর দুধ পান না করে বরং নিজের মাকে সনাক্ত করে ওনার দুধ পান করে এটা প্রমাণিত করলেন যে নবী শৈশবকালেও এ ধরণের জ্ঞান বুদ্ধি রাখেন, যা সাধারণ লোকদের মধ্যে থাকে না। নবীগণকে নিজেদের মত মানুষ ধারণাকারীদের কাউকে যদি শৈশবকালে

কুকুরের দুধ পান করতে দেয়া হতো, তাহলে নিশ্চয় খেয়ে ফেলতো। কিন্তু নবীর শান দেখুন, তিনি শৈশবে তাঁর মায়ের দুধ ভিন্ন অন্য কোন মহিলার দুধও পান করেননি। তাই নবীকে আমাদের মত মানুষ মনে করাটা বড় মূর্খতার পরিচায়ক।

কাহিনী নং- ৬৯

ফেরাউনের মেয়ে

ফেরাউনের এক মেয়ে ছিল, যার শ্বেতী রোগ হয়েছিল। ফেরাউন বড় বড় ডাক্তার দ্বারা ওর চিকিৎসা করালো কিন্তু কোন ফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভবিষ্যদ্বক্তাদের কাছে ওর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। ওরা বললো, এর আরোগ্য লাভ নদী থেকে পাওয়া যাবে। ঠিকই তাই হয়েছে। একদিন ফেরাউন তার স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে নদীর তীরে বসেছিল। তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সিন্দুকটা ভেসে আসছিল। যখন এ সিন্দুকটা ফেরাউনের সামনে আনা হলো ও খোলা হলো, তখন মূসা আলাইহিস সালামকে দেখলো, তিনি স্বীয় আঙ্গুল চুষছিলেন। ফেরাউনের স্ত্রী আসিয়ার মনে মূসা আলাইহিস সালামের প্রতি খুবই মায়া হলো, তিনি ওকে উঠায়ে নিলেন। ফেরাউনের মেয়ের মনেও এ নুরানী শিশুর প্রতি খুবই মায়া হলো। সে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের মুখের থুথু মুবারক নিয়ে স্বীয় শরীরে মালিশ করলো। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে ওর শ্বেতী অদৃশ্য হয়ে গেল। (নজহাতুল মাজালিস ২০৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ নবীগণের থুথু মুবারকও বালা মছিবত দূরীভূতকারী হয়ে থাকে। তাই যে সব লোকের থুথু বিভিন্ন রোগের মারাত্মক জীবানু ছড়ায়, ওরা ওসব পূণ্যাত্মা মনীষীগণের মত কি করে হতে পারে?

কাহিনী নং- ৭০

মূসা আলাইহিস সালামের ঘুষি

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের বিশ বছর বয়সে একদিন ফেরাউনের ঘর থেকে শহরে বেড়াতে বের হয়েছিলেন। তিনি পথে দু'ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে দেখলেন। ওদের একজন ফেরাউনের বাবুর্চি ছিল এবং অপরজন মূসা আলাইহিস সালামের কউম বনী ইসরাইলের লোক ছিল। ফেরাউনের বাবুর্চী লাকড়ীর বোঝাটা লোকটির মাথায় তুলে দিয়ে ফেরাউনের বাবুর্চী খানায় নিয়ে যাবার জন্য চাপ দিচ্ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ব্যাপারটা উপলব্ধি করে বাবুর্চীকে বললেন, গরীব

লোকটার প্রতি জুলুম করো না। কিন্তু সে কর্ণপাত করলো না বরং গালিগালাজ করতে লাগলো। এতে মূসা আলাইহিস সালামের রাগ এসে গেল এবং ওকে এক ঘুষি মারলেন। সেই ঘুষিতে সে মারা গেল এবং ওখানেই পড়ে রইলো। কুরআন করীম ১০ পারা, ৫ আয়াত, রুহুল বয়ান ৯৬৫ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ নবীগণ মজলুমদের সাহায্যকারী হয়ে তশরীফ এনেছেন। নবীগণ সীরত, সুরত ও শক্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে থাকেন। হযরত মূসা নবীর ঘুষিটা উল্লেখযোগ্য ছিল। তাই এক ঘুষিতে জালিমের জুলুম বন্ধ হয়ে গেল।

কাহিনী নং- ৭১

মূসা আলাইহিস সালামের চড়

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে যখন মৃত্যুর ফিরিশতা উপস্থিত হলেন, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ওকে এমন এক চড় মারলেন যে মৃত্যুর ফিরিশতার চোখ বের হয়ে গেল। মৃত্যুর ফিরিশতা সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে ফিরে গিয়ে আরয করলেন, হে আল্লাহ! আজ আপনি আমাকে আপনার এমন এক বান্দার কাছে পাঠালেন, যিনি মরতে চান না। দেখুন, উনি আমাকে চড় মেরে আমার চোখ বের করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ওর চোখ ঠিক করেদিলেন এবং বললেন, আমার বান্দা মূসার কাছে পুনরায় যাও এবং সাথে একটি ষাঁড় নিয়ে যাও। ওনাকে গিয়ে বল, যদি আরও বেঁচে থাকতে চান, তাহলে এ ষাঁড়ের পিঠের উপর হাত রাখুন। যত লোম আপনার হাতের নিচে পড়বে, তত বছর আপনি জীবিত থাকতে পারবেন। সুতরাং মৃত্যুর ফিরিশতা ষাঁড় নিয়ে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, হুযুর আপনি এর পিঠের উপর হাত রাখুন। যত লোম আপনার হাতের নিচে পড়বে, তত বছর আপনি জীবিত থাকতে পারবেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, ততবছর পর পুনরায় তুমি হাজির হবে? আরয করলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তাহলে দরকার নেই, এখনই নিয়ে যাও। (মিশকাত শরীফ ৪৯৯ পৃঃ))

সবক ঃ আল্লাহর নবীগণের এমন শান মান যে, ইচ্ছে করলে মৃত্যুর ফিরিশতাকে চড় মেরে চোখ বের করে ফেলতে পারেন। নবীগণ ওরকম হয়ে থাকেন যে, তাঁরা মৃত্যু বরণের ইচ্ছে করলে মৃত্যুর ফিরিশতা কাছে আসেন আর যদি মৃত্যুবরণ করতে না চান, তাহলে ফিরে চলে যান। অথচ সাধারণ লোকদের জন্ম মৃত্যু আপন গতিতে চলে, কারো খেয়াল খুশীমত হয় না।

কাহিনী নং- ৭২

মদয়ানের কূপ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বড় হয়ে যখন সত্যের প্রচার এবং ফেরাউন ও তার অনুসারীদের গুমরাহীর কথা বর্ণনা করতেন, তখন বনী ইসরাইলের লোকেরা তাঁর কথা শুনতেন এবং তাঁর অনুসরণ করতেন। তিনি যে ফেরাউন ধর্মের বিরোধীতা করেন, এবং তাঁর ঘুষিতে ফেরাউনের বাবুর্চী যে মারা গেল,এটা যখন ফেরাউন লোকদের কাছে জানা জানি হয়ে গেল, তখন ফেরাউন হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন। লোকেরা মূসা আলাইহিস সালামের সন্ধানে বের হলো, ফেরাউনের লোকদের মধ্যে একজন মূসা আলাইহিস সালামের ভক্ত ছিল। সে দৌড়ে এসে মূসা আলাইহিস সালামকে খবর দিল এবং বললো, আপনি এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যান। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ঐ অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন। তিনি মদয়ান যেতে ইচ্ছে করলেন, যেখানে হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম বসবাস করেন এবং এ শহর ফেরাউনের সাম্রাজ্যের বাইরে ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে মদয়ানের রাস্তার কোন খবর ছিল না, না ছিল কোন বাহন বা সাথী। তাই আল্লাহ তাআলা একজন ফিরিশতা পাঠালেন, যিনি ওনাকে মদয়ান পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম এ শহরেই থাকতেন। তাঁর দুটি কন্যা ছিল। ছাগল পালনই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের উৎস।

মদয়ানে একটি প্রসিদ্ধ কূপ ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমে সেই কূপের কাছে পৌঁছেন। তিনি তথায় দেখলেন যে অনেক লোক কূপ থেকে পানি উঠাচ্ছে এবং নিজেদের পশুগুলোকে পান করাচ্ছে। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের মেয়ে দুটিও নিজেদের ছাগল গুলো নিয়ে পাশে আলাদাভাবে দাঁড়ানো ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম মেয়েদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা তোমাদের ছাগলগুলোকে কেন পানি পান করাচ্ছ না? ওরা বললো, আমরা পানি উঠাতে পারি না। এসব লোক চলে যাবার পর যে পানি হাউজে অবশিষ্ট থাকবে, সেগুলো আমাদের ছাগলগুলোকে পান করাবো। একথা শুনে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দয়া হলো। পাশে আর একটি কূপ ছিল, যেটা একটি খুবই ভারী পাথরে ঢাকা ছিল এবং যেটা সহজে সরানো যেত না। তিনি একাই সেটা সরায়ে দিলেন এবং বালতি ফেলে পানি উঠায়ে ছাগলগুলোকে পান করালেন। মেয়েদ্বয় ঘরে গিয়ে হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামকে বললো,

আব্বাজান, আমাদের এ শহরে একজন পূন্যবান, শক্তিশালী নওজোয়ান আগন্তুক এসেছেন, যিনি আমাদের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের ছাগল গুলোকে পানি পান করায়েছেন। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম ওদের একজনকে বললেন, যাও, সেই পূণ্যবান লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। কথামত বড় মেয়েটি একান্ত পর্দা সহকারে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আসলেন এবং বললেন, আমার আব্বা আপনাকে পারিশ্রমিক প্রদান করার জন্য ডেকেছেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পারিশ্রমিক নিতে রাজি হলেন না। তবে হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের সাথে দেখা করতে রাজি হলেন। তিনি সাহেবজাদীকে বললেন আপনি আমার পিছনে রয়ে রাস্তা দেখায়ে নিয়ে চলুন। এটা তিনি পর্দার খাতিরে বলেছিলেন এবং এভাবে তিনি তশরীফ নিয়ে যান। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের কাছে পৌছার পর হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামকে তিনি ফেরাউনের অবস্থা, তাঁর জন্ম থেকে শুরু করে ফেরাউনের বাবুর্চীর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী শুনালেন। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম বললেন, এখন আর কোন চিন্তা কর না। তুমি জালিমদের থেকে মুক্তি পেয়ে এখানে চলে এসেছ। তুমি এখানে আমার কাছে থাক।

সবক ঃ জালিম ও অহংকারী শাসক আল্লাহ ওয়ালাদের সামনে পরাভূত হয়ে যায়। আল্লাহ ওয়ালাগণ আপদ মছিবতে ছবর করেন। কিন্তু হকের প্রচার থেকে বিরত থাকেন না। আল্লাহ তাআলা তাঁর ওসব সত্যবাদী বান্দাদের হেফাজত করেন।

কাহিনী নং-৭৩

বৃক্ষ থেকে আওয়াজ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের সান্নিধ্যে দশ বছর ছিলেন। হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালাম তাঁর এক মেয়েকে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বিবাহ দেন। দশ বছর পর হযরত শোয়াইব আলাইহিস সালামের অনুমতি নিয়ে তিনি তাঁর মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য মিশরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর স্ত্রীও সাথে ছিলেন। পথে রাত্রি বেলায় এক জংগল অতিক্রম করার সময় পথ হারিয়ে ফেলেন। অন্ধকার রাত ও শীতের মৌসুম ছিল। ঐ সময় তিনি অনতিদূরে আগুন চমকাতে দেখতে পেলেন। তিনি স্ত্রীকে বললেন, তুমি এখানে দাঁড়াও। আমি ঐযে দূরে আগুন দেখা যাচ্ছে, সেখানে যাচ্ছি। হয়তো ওখানে পথের সন্ধান পেতে পারি এবং তোমার শীত নিবারণের জন্য আগুনও আনতে পারবো। অতপর তিনি স্ত্রীকে

ওখানে বসায়ে সেই আগুনের দিকে গেলেন। কাছে গিয়ে একটি সুন্দর সবুজ বৃক্ষ দেখলেন, যেটা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত খুবই উজ্জ্বল ছিল। তিনি বৃক্ষটির যত কাছে যেতে চাইলেন বৃক্ষটি তত দূরে সরে যায় এবং যখন দাঁড়িয়ে যান, তখন সেটা কাছে এসে যায়। তিনি এ নুরাণী বৃক্ষের এ অদ্ভুত আচরণ দেখছিলেন। এরই মধ্যে সেই বৃক্ষ থেকে আওয়াজ বের হলো, হে মূসা! আমি সমস্ত জাহানের প্রতি পালক আল্লাহ, তুমি বড় পবিত্র জায়গায় এসেছ, জুতা খুলে ফেল এবং তোমার প্রতি যা ওহী হচ্ছে, মনোযোগসহকারে শুন, আমি তোমাকে পছন্দ করেছি। (কুরআন করীম ১৬ পারা ৬ আয়াত ২০ পারা ৭ আয়াত , খাযায়েনুল এরফান-- ৪৪২ ও ৫৪৯ পৃঃ)

সবক ঃ নাবুয়ত হচ্ছে খাস আল্লাহ প্রদত্ত। এতে মেহনত বা প্রচেষ্টার কোন স্থান নেই। অর্থাৎ নাবুয়ত কোন কোর্স পূর্ণ করা বা মেহনত করার দ্বারা অর্জিত হয় না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছে করেন, তাকে এ সম্মানের অধিকারী করে দেন। যেমন মূসা আলাইহিস সালাম গেলেন আগুন আনতে এবং ফিরলেন নাবুয়ত নিয়ে এবং এ সিলসিলা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত জারী ছিল। সে কতবড় মূর্খ যে বলে যে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ পড়ার দ্বারা মানুষ নবী হতে পারে।

কাহিনী নং-৭৪

ভয়ানক সাপ

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের হাতে একটি লাঠি ছিল। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে মূসা লাঠিটা মাটিতে রাখ হযরত মূসা সেটা মাটিতে রাখলেন। দেখতে দেখতে সেটা একটি ভয়ানক সাপের আকৃতি ধারণ করে নড়াছড়া করতে লাগলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ দৃশ্য দেখে মুখ ফিরায়ে নিলেন এবং ভয়ে পিছন ফিরে দেখলেন না। আল্লাহ তাআলা ফরমালেন, হে মুসা! ভয় করো না। একে ধরে ফেল, এটা পুনরায় লাঠি হয়ে যাবে। নির্দেশ মতে তিনি সাপটি ধরার সাথে সাথে সেটা লাঠি হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে এ মুজেজা দান করে ফরমালেন, এবার ফেরাউনের কাছে যাও এবং ওকে ভয় দেখাও, ওকে বুঝাও যেন কুফরী ও ঔদ্বত্য আচরণ ত্যগ করে। যদি সে মুজেজা দেখতে চায়, তাহলে এ লাঠি মাটিতে ফেলে ওকে দেখাও। (কুরআন করীম ১৬ পারা, ১০ আয়াত)

সবক ঃ নবীগণকে আল্লাহ তাআলা বড় বড় মুজেজা দান করেন, ফলে ওনারা এমনএমন কাজ করে দেখান, যা অন্যরা কখনো করতে পারে না।

কাহিনী নং- ৭৫

অজগরের আক্রমন

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম নাবুয়াত লাভ করার পর ফেরাউনের কাছে গিয়ে বললেন, হে ফেরাউন! আমি আল্লাহর রসূল এবং ন্যায় ও সত্যের ঝান্ডাবাহক। তুমি খোদায়ী দাবী ত্যাগ কর এবং এক আল্লাহর পূজারী হয়ে যাও। ফেরাউন বললো, তুমি যদি আল্লাহর রসূল হয়ে থাক, তাহলে কোন নমুনা দেখাও। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম- এ দেখ, বলে নিজের লাঠিটা মাটিতে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা এক বিরাট অজগর সাপ হয়ে গেল। পাণ্ডবর্ণের মুখ হা করে মাটি থেকে এক মাইল উঁচু হয়ে লেজের উপর দাঁড়িয়ে গেল এবং এর একটি চোয়াল মাটিতে অপরটি শাহী মহলের দেয়ালে রেখে ফেরাউনের দিকে তাকালো। তখন ফেরাউন স্বীয় সিংহাসন থেকে লাফ দিয়ে নেমে পালিয়ে গেল। যখন অন্যান্য লোকদের দিকে তাকালো, তখন ওরাও এমন ভাবে পালালো যে, ওদের পায়ের তলে পৃষ্ঠ হয়ে অনেক লোক মারা গেল। ফেরাউন ঘরের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলতে লাগলো, হে মূসা, তোমাকে যে রসূল বানিয়েছে, তার, কসম দিয়ে বলছি, একে ধরে ফেল। হযরত মূসা আলাইহিস সাললাম একে যখন উঠায়ে নিলেন, তখন আগের মত লাঠি হয়ে গেল এবং ফেরাউনের স্বস্তি ফিরে আসলো। (কুরআন করীম ৯ পারা, ৩ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান- ২৩৬)

সবক ঃ নবীগণ বড় শানশওকতের অধিকারী ও বড় শক্তিশালী হয়ে থাকেন। যত বড় রাজা বাদশাহ হোক না কেন ওনাদের মুকাবেলা করতে পারেনা।

কাহিনী নং- ৭৬

যাদুকরদের পরাজয়

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া ফেরাউনের জন্য বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো এবং সে খুবই ঘাবড়িয়ে গেল। ফেরাউনের দরবারী চেলা চামুন্ডারা বলতে লাগলো, মূসা হয়তো কোন জায়গা থেকে যাদু শিখে এসেছে। এখন আপনিও আপনার রাজ্যের সকল যাদুকর একত্রিত করে এর মুকাবেলায় নিয়োজিত করতে পারেন। পরামর্শ মুতাবিক ফেরাউন চারিদিকে লোক পাঠিয়ে দিল, যেন সব জায়গা থেকে যাদুকর খুঁজে নিয়ে আসে। যখন কয়েক হাজার যাদুকর ফেরাউনের দরবারে এসে সমবেত হলো, তখন ফেরাউন মূসা আলাইহিস সালামকে ওসব যাদুকরদের

সাথে মুকাবিলা করার জন্য চ্যালেঞ্জ ঘোষনা করলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। ফেরাউন জিজ্ঞেস করলো, মুকাবিলা কোন দিন করবে? তিনি বললেন তোমাদের মেলার দিন হলে ভালো হয়। এ দিন ওরা খুবই সাজসজ্জা করে বিরাট মেলার আয়োজন করে। দূরদরাজ থেকে অনেক লোক আসে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এ দিনটা এ জন্য নির্ধারণ করলেন যেন ওদের আনন্দঘন এ দিনে সবার সামনে সত্য প্রকাশিত হয়ে যায়। নির্ধারিত দিনে হাজার হাজার যাদুকর নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালামও তশরীফ নিয়ে গেলেন।

সমবেত হাজার হাজার যাদুকরেরা তাদের নিজ নিজ রশি ও লাঠি মাটিতে ফেলার সাথে সাথে সাপ হয়ে গেল এবং এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে লাগলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম দেখলেন সমস্ত এলাকা সাপে ভরে গেল। মেলার মাঠে শুধু সাপ আর সাপ ছুটাছুটি করছিল। এ ভয়ানক দৃশ্য দেখে লোকেরা বিস্মিত হয়ে গেল। এবার মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর লাঠিও মাটিতে ফেললেন। দেখতে দেখতে এক বিরাট অজগর সাপ হয়ে গেল এবং যাদুকরদের যাদুর সাপ গুলোকে একটা একটা করে গিলতে লাগলো, অল্পক্ষণের মধ্যে যাদুকরদের সমস্ত রশি ও লাঠি যেগুলো সাপ হয়ে কিলবিল করছিল এবং যেগুলো তিনশ উটের বোঝা ছিল, সব খেয়ে শেষ করে দিল। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালাম ওটাকে যখন হাতে নিয়ে নিলেন, তখন আগের মত লাঠি হয়ে গেল। এবং ওজন ও আকৃতি আগের মত রইলো। এটা দেখে যাদুকররা বুঝতে পারলো যে, মূসার লাঠি যাদুর লাঠি নয়। মানুষের ক্ষমতায় এ রকম বিস্ময়কর দৃশ্য দেখাতে পারে না। নিশ্চয় এটা আসমানী শক্তি। এটা বুঝতে পেরে ওরা সবাই اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (সমস্ত জগতের প্রভুর প্রতি আমরা ঈমান আনলাম) বলে সিজদায় পতিত হলো এবং ঈমান আনলো। (কুরআন শরীফ ৯ পারা, ৪ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান- ২৩৭)

সবক ঃ সত্যের জয় অবিসম্ভাবী এবং বাতিল চির পরাভূত।

কাহিনী নং- ৭৭

পানির আজাব

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের লাঠি মুবারক অজগর সাপ হয়ে যেতে দেখে ফেরাউনের ভাগ্যবান যাদুকরেরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের উপর ঈমান আনলো কিন্তু ফেরাউন ও তার ফেরাউনী গোষ্ঠী স্বীয় কুফরী থেকে ফিরে এলো না। হযরত মূসা

আলাইহিস সালাম এ অবাধ্যতা দেখে ওদের ব্যাপারে বদদুআ করলেন- হে আল্লাহ ফেরাউন বড় অবাধ্য হয়ে গেছে। তার কউমও ওয়াদা ভঙ্গকারী ও অহংকারী হয়ে গেছে। ওদেরকে এমন আযাবে লিপ্ত কর, যেন ওদের জন্য উপযুক্ত শাস্তি হয় এবং আমার কউম ও পরবর্তী বংশধরদের জন্য শিক্ষণীয় হয়।

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ বদদুআ কবুল হয়ে গেল। আল্লাহ তাআলা ফেরাউনের অনুসারীদের জন্য ভয়াবহ তুফান সৃষ্টি করলেন। মেঘের ঘনঘটা লক্ষ্য করা গেল চারিদিক অন্ধকারে ছেয়ে গেল এবং অধিক বৃষ্টিপাত হলো, ফেরাউনের অনুসারীদের ঘরে গলা পর্যন্ত পানি হলো। ওদর মধ্যে যারা বসাছিল, তারা ডুবে গেল। এদিক সেদিক নড়াচড়া ও কোন কাজ কর্ম করতে পারলো না। এক শনিবার থেকে আর এক শনিবার পর্যন্ত সাত দিন মছিবতে লিপ্ত ছিল। আল্লাহ তাআলার কুদরতের বাহাদুরী দেখুন, বনী ইসরাইলের ঘরসমূহ ফেরাউনের চেলাদের ঘরের পাশাপাশি হওয়া সত্ত্বেও ওদের ঘরে পানি প্রবেশ করেনি। যখন ওরা একেবারে অপারগ হয়ে গেল, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সমীপে এসে আরয করলো, আমাদের থেকে এ মছিবত অপসারিত হয়ে যাবার জন্য আপনার প্রতিপালকের কাছে দুআ করুন। এ মছিবত অপসারিত হলে আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। অতঃপর মূসা আলাইহিস সালামের দুআর পর তুফানের মছিবত দূরীভূত হয়ে যায়। (কুরআন করীম ৯ পারা ৬ আয়াত)।

সবকঃ যে পানি আমাদের জীবন ধারনের জন্য অপরিহার্য, সেটা যখন আল্লাহর গজবে পরিণত হয়ে আসে, তখন আমাদের জানমানের অনেক ক্ষতি হয়। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দুআয় বড় বড় আজাব দূরীভূত হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৭৮

পঙ্গপাল

ফেরাউনের কউম মূসা আলাইহিস সালামকে জ্বালাতন করায় তাঁর বদদুআয় ওদের উপর পানির গজব এসেছিল, যার ফলে ওদের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ওরা পুনরায় মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে অনুনয় বিনয় করতে লাগলো এ আজাব দূরীভূত হওয়ার জন্য দুআ করুন। আমরা আপনার উপর ঈমান আনবো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন দুআ করলেন, পানি সরে গেল এবং সেই পানি রহমাতের রূপ ধারণ করে চারিদিকে সবুজের সমারোহ সৃষ্টি করলো। শস্য উৎপন্ন খুবই বেশী হলো,

গাছপালা খুবই বৃদ্ধি পেল। এ রকম সজিবতা এর আগে আর কখনও দেখা যায়নি। ফেরাউনের লোকেরা বলতে লাগলো, এ পানি তো নেয়ামতই ছিল মূসার উপর ঈমান আনার কি প্রয়োজন। তাই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আগের মত রয়ে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পনুরায় ওদের জন্য বদদুআ করলেন। এক মাস অতিবাহিত হতে না হতে আল্লাহ তাআলা ওদের প্রতি পঙ্গপাল পাঠালেন। এগুলো ওদের ক্ষেত, গাছের ফল এমনকি ওদের ঘরের দরজা, ছাদ, ইত্যাদিও খেয়ে ফেললো। আল্লাহর কুদরত দেখুন, এ পঙ্গপাল ফেরাউনের লোকদের ঘরে প্রবেশ করলো কিন্তু বনী ইসরাইলের লোকদের ঘরের কাছেও গেল না। অসহ্য হয়ে সেই অবাধ্যরা পুনরায় মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে এ আজাব অপসারণের জন্য অনুরোধ করলো এবং ওয়াদা করলো যে, এ আজাব অপসারিত হওয়ার পর তারা এবার নিশ্চয় ঈমান আনবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দুআ দ্বারা পঙ্গপালের আজব দূরীভূত হয়ে গেল কিন্তু ওরা পূর্ববৎ ওয়াদা ভঙ্গ করে কাফিরই রয়ে গেল। (কুরআনে করীম ৯ পারা, ৬ আয়াত, খাযায়েনুল এ বয়ান ২২৯ রুহুল এরফান ৭৬০ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ মানুষ যখন ধর্মদ্রোহীতার চরম সীমায় পৌঁছে যায় তখন আল্লাহ তাআলা কোন দুর্বল প্রাণীর দ্বারা তাদের সেই অংহকার খর্ব করেন। অলস প্রকৃতির লোকেরা কোন বিপদ আসলে আল্লাহর দিকে ফিরে যাবার দৃঢ় সংকল্প করে কিন্তু বিপদ দূরীভূত হওয়ার পর পুনরায় সেই আগের অবস্থায় ফিরে যায়। এটার পরিণতি কিন্তু খুবই মারাত্মক।

কাহিনী নং- ৭৯

উকুন ও ব্যাঙ

পঙ্গ পালের আজাব দূরীভূত হওয়ার পর ফেরাউনের লোকেরা যখন ওয়াদা ভঙ্গ করে আগের মত কুফরীতে অটল রইলো, তখন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম পুনরায় ওদের জন্য বদদুআ করলেন। এবার ওদের উপর উকুনের আযাব নাজিল হলো। এ উকুনগুলো ওদের কাপড়ের ভিতর ঢুকে ওদের শরীরে কামড় দিত, ওদের খাবারে ভরে যেত, ঘুনের আকৃতিতে ওদের গমের বস্তায় বিস্তার লাভ করে গম বিনষ্ট করে ফেলতো। দশ বস্তা গম পিষে দুই তিন সেরের অধিক আটা পাওয়া যেত না। ওদের শরীরের উপর উকুনের এত উপদ্রব ছিল যে ওদের চুল, পশম, চোখের পলক ইত্যাদি খেয়ে ওদের সমস্ত শরীর বসন্ত রোগের দাগের মত করে ফেলেছিল। এক মুহূর্ত্ব আরামে শোয়াটা ওদের জন্য অসাধ্য ছিল। এ মছিবত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ওরা

পুনরায় মুসা আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং ঈমান আনার ওয়াদা করলো। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ওদের জন্য দুআ করলেন এবং আজাব অপসারিত হয়ে গেল। কিন্তু ওরা পুনরায় ওয়াদা ভঙ্গ করে কুফরীতে অটল রইলো। মুসা আলাইহিস সালাম পুনরায় ওদের জন্য বদদুআ করলেন। এবার আল্লাহ তাআলা ওদের উপর ব্যাঙের আজাব নাজিল করলেন। অবস্থা এমন হলো-ওরা যেখানে বসতো ওদের কোল ব্যাঙে ভরে যেত, কথা বলার জন্য মুখ খুললে, মুখে ব্যাঙ ঢুকে যেত। হাড়ি-পাতিল খাবারে ব্যাঙে এসে যেত। চুলায় ব্যাঙ ভরে যেত এবং আগুন নিভে যেত। বিছানায় শুইলে শরীরের উপর অগনিত ব্যাঙ এসে যেত। অসহ্য হয়ে তারা কেঁদে দিত। শেষ পর্যন্ত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসে আরয করলো, আমরা আর ওয়াদা ভঙ্গ করবো না। এবার দৃঢ়ভাবে ওয়াদা করছি। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে এ মছিবত থেকে মুক্ত করুন। মূসা আলাইহিস সালাম পুনরায় দুআ করলেন এবং আজাবও দমন হয়ে গেল। কিন্তু তামাশা দেখুন, ওরা আবারও ওয়াদা ভঙ্গ করলো এবং স্বীয় কুফরীতে অটল রইলো। (কুরআন করীম ৯ পারা, ৬ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ২৪০ পৃঃ, রুহুল বয়ান ৭৬০ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ কাফিরদের ওয়াদায় কোন বিশ্বাস নেই। বার বার ওয়াদা ভঙ্গ করা কাফিরদের কাজ। মুসলমান স্বীয় ওয়াদায় অটল থাকে।

কাহিনী নং- ৮০

রক্ত আর রক্ত

উকুন ও ব্যাঙের আজাব থেকে রেহাই পাবার পর ফেরাউনের লোকেরা পুনরায় ওয়াদা ভঙ্গ করে কুফরীতে অটল রইল।মূসা আলাইহিস সালাম আবার বদদুআ করলেন। এবার কূপ খাল-বিল-ঝর্ণা, নিলনদের পানি মোট কথা সব পানি ওদের জন্য তাজা রক্ত হয়ে গেল। ওরা এ নয়া মছিবতের কারণে খুবই পেরেশান হলো। পানি হাতে নেয়ার সাথে সাথে রক্ত হয়ে যেত। আল্লাহ কুদরত দেখুন, বনী ইসলাইলের লোকদের জন্য পানি পানিই রইলো। কিন্তু ফেরাউনের লোকেদের জন্য সব পানি রক্ত হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে বনী ইসরাইলের লোকদের সাথে মিলে একই পাত্র দ্বারা কূপ থেকে পানি উঠাতে মনস্থ করলো, কিন্তু তখনও একই অবস্থা। বনী ইসরাইলের লোকেরা যখন উঠাতো তখন পানিই উঠতো কিন্তু ফেরাউনের লোকেরা উঠালে সেই পাত্রে রক্তই দেখা যেত। এমন কি ওদের মহিলারা পানির তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে বনী ইসরাইলের মহিলাদের কাছে এসে পানি চাইতো কিন্তু পানি ওদের হাতে যওয়া মাত্রই

রক্ত হয়ে যেত। অপারগ হয়ে ওরা বলতে লাগলো, আপনাদের মুখে পানি নিয়ে আমাদের মুখে কুলি করে দাও। কিন্তু তখনও বনী ইসলাইলের মহিলাদের মুখের পানি ওদের মুখে যাবার সাথে সাথে রক্ত হয়ে যেত।

ওরা পানির তৃষ্ণায় একেবারে কাবু হয়ে গেল। গাছের রস পান করতে চাইলো। সেটাও মুখে পৌছার সাথে সাথে রক্ত হয়ে যেত। আল্লাহর এ গজব থেকে বাঁচার কোন উপায় না দেখে পুনরায় মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং আর একবার দুআ করার জন্য অনুরোধ করলো, এবং দৃঢ়তার সাথে বললো এবার আজাব বিদূরীত হলে নিশ্চয় নিশ্চয় ঈমান আনবো। অতএব মূসা আলাইহিস সালাম দুআ করলেন এবং ওদের থেকে আজাবও রহিত হয়ে গেল। কিন্তু সেই বেঈমানের দল এবারও তাদের ওয়াদায় অটল রইলো না। (কুরআন করীম ৯পারা, ৬ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান২৪০ রুহুল বয়ান ৭৬০ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর নাফরমান বান্দাদের বার বার সুযোগ দেন যেন তারা সংশোধন হয়ে যায়। কিন্তু কুফরীতে নিমর্জিত এ সব বান্দারা সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে না এবং স্বীয় কুফরীর উপর অটল থাকে এবং ক্ষতির শিকার হয়।

কাহিনী নং- ৮১

ফেরাউনের বিনাশ

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন ফেরাউন ও তার অনুসারীদের ঈমান আনয়ন সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি ওদের বিনাশের জন্য বদদুআ করলেন এবং বললেনঃ "হে আমার পরওয়ারদেগার! ওদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও। ওদের মন শক্ত করে দাও যেন ঐ পর্যন্ত ঈমান না আনে যতক্ষন ভয়াবহ আজাব না দেখে।"

হযরত মূসা আলাইহিস সালামের এ দুআ কবুল হলো এবং আল্লাহ তাআলা ওনাকে নির্দেশ দিলেন যেন বনী ইসরাইলের লোকদেরকে নিয়ে রাতারাতি শহর থেকে বের হয়ে যায়। অতএব হযরত মূসা আলাইহিস সালাম স্বীয় কউমকে বের হয়ে যাবার খোদায়ী নির্দেশের কথা শুনালেন। বনী ইসরাইলের মহিলারা ফেরাউনী মহিলাদের কাছে গিয়ে বলতে লাগলো, আমাদেরকে একটি মেলায় অংশগ্রহণ করতে হচ্ছে, ওখানে পরিধান করে যাবার জন্য আপনাদের অলংকারগুলো ধার হিসেবে চাচ্ছি। এতে রাজি হয়ে ওরা নিজ নিজ অলংকারসমূহ দিয়ে দিল। অতঃপর বনী ইসরাইলের লোকেরা স্ত্রী-সন্তানসহ রাতারাতি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বের হয়ে গেল। ওরা ছোট বড় সবাই মিলে প্রায় ছয় লাখের মত ছিল। ফেরাউনের কানে যখন এ খবর পৌছলো, তখন সেও ওদের পিছু নেয়ার জন্য রাতারাতি তৈরী হয়ে গেল এবং স্বীয় কউমের লোকদের নিয়ে পিছে পিছে বের হলো। ফেরাউনের বাহিনীর

সংখ্যা ওদের দ্বিগুন ছিল। ভোর হতেই ফেরাউনের লোকেরা বনী ইসরাইলীদেরকে দেখে ফেললো। বনী ইসরাইলের লোকেরা যখন দেখলো যে ফেরাউন তার বাহিনীসহ তেড়ে আসতেছে, এদিকে নীল নদও সামনে পড়লো। এখন কি করা, অস্থির হয়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আরয করলো। মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর লাঠি মুবারক নদীতে নিক্ষেপ করলেন। এতে নদী দু ভাগ হয়ে গেল এবং মাঝখানে বারটি রাজপথের সৃষ্টি হলো। বনী ইসরাইলের লোকেরা এ রাস্তাগুলোর উপর দিয়ে নদী পার হয়ে গেল। ফেরাউনের বাহিনী যখন নদীর কাছে আসলো তখন তারাও নদী অতিক্রম করার জন্য ওসব রাস্তা দিয়ে যেতে শুরু করলো। যখন ফেরাউন ও তার বাহিনী ঐ বার রাস্তার উপর উঠে গেল, তখন আল্লাহ তাআলা নদীকে নির্দেশ দিলেন -মিলে যাও এবং ওদের সবাইকে ডুবায়ে ফেল। সঙ্গে সঙ্গে নদী মিলে গেল এবং ফেরাউন বিরাট বাহিনীসহ নদীতে ডুবে মারা গেল।

সবক ঃ সীমা অতিরিক্ত কুফরী ও অবাধ্যতার পরিনাম খুবই ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে এবং এর জন্য এ পৃথিবীতেও ধ্বংস ও ক্ষতির শিকার হতে হয়।

কাহিনী নং- ৮২

নিমক হারাম গোলাম

একবার জিব্রাইল আলাইহিস সালাম ফেরাউনের কাছে একটি বিষয়ে ওর অভিমত চাইলেন। বিষয়টা হলো, একজন গোলাম স্বীয় মনিবের খেয়ে পরে লালিতপালিত হয়ে ওর নাশোকরী করলো, ওর হককে অস্বীকার করলো এবং নিজেকে নিজে মনিব হওয়ার দাবী করলো। এ ধরণের গোলামের ব্যাপারে সে কি নির্দেশ দিবে? এ বিষয়ের উপর ফেরাউন লিখিত ভাবে অভিমত ব্যক্ত করলো যে, যে নিমক হারাম গোলাম স্বীয় মনিবের অবদান সমূহকে অস্বীকার করে এবং মনিবের প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়, ওর শাস্তি হচ্ছে ওকে নদীতে ডুবায়ে মারা।

ফেরাউন যখন স্বয়ং নদীতে ডুবে যাচ্ছিল, তখন হযরত জিব্রাইল তার সেই ফতওয়া তার সামনে এনে দিল। ফেরাউন তখন বিষয়টি বুঝতে পারলো। (খাযায়েনুল এরফান ৩১১ পৃঃ)

সবক ঃ মানুষ যদি স্বীয় চাকরের অবাধ্যতায় রাগান্বিত হয়ে ওকে শাস্তি দেয়, তাহলে সে নিজেও যেন স্বীয় আসল মানিবের অবাধ্যতার শাস্তি ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকে।

কাহিনী নং- ৮৩

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ও এক বুড়ী

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম যখন নদী পার হওয়ার জন্য নদীর কিনারা পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন

দেখলেন যে বাহনের পশুগুলোর মুখ আল্লাহ তাআলা ফিরায়ে দিয়েছেন যেন ওগুলো ফিরে আসে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আরয করলেন, হে আল্লাহ! এ রকম কেন করা হলো? ইরশাদ হলো, তোমরা ইউসুফের কবরের কাছে অবস্থান করতেছ; ওর লাশটা তোমাদের সাথে নিয়ে যাও। মূসা আলাইহিস সালামের কাছে কবরের অবস্থান জানা ছিল না। তাই তিনি তার সাথীদের মধ্যে কেউ জানে কিনা জিজ্ঞেস করলেন, তারা বললো, হয়তো বনী ইসরাইলের অমুক বুড়ী জানতে পারে। ওকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালামের কবর কোথায় তোমার জানা আছে? বুড়ী বললো, হ্যাঁ, জানা আছে। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ জায়গায়? বুড়ী বললো, খোদার কসম, আমি ততক্ষণ বলবো না, যতক্ষণ আপনি আমার প্রার্থনা মনজুর করবেন না। মূসা আলাইহিস সালাম ফরমালেন, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হলো। বল, কি চাও? বুড়ী বললো, হযূরের কাছে আমি এটাই প্রার্থনা করি যে, জান্নাতে আমি আপনার সাথে একই মর্যাদায় যেন অবস্থান করি। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফরমালেন, জান্নাতই কামনা কর। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট।এর থেকে অধিক কামনা করো না। বুড়ী বললো, খোদার কসম, আপনার সাথে জান্নাতে সমঅবস্থান ছাড়া অন্য কিছুতে আমি রাজি নই। এভাবে মূসা আলাইহিস সালামের সাথে বাদানুবাদ চলছিল। ইত্যবসরে আল্লাহ তাআলা ওহী নাযিল করলেন, হে মূসা! সে যা কামনা করছে, তা ওকে দিয়ে দাও। এতে তোমার কোন ক্ষতি নেই। সুতরাং মূসা আলাইহিস সালাম ওকে জান্নাতে তাঁর সমমর্যাদায় স্থান দিতে রাজি হলেন। তখন বুড়ী হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কবর দেখায়ে দিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেখান থেকে লাশ মুবারক উঠায়ে নিজের সাথে নিয়ে গেলেন। (তিবরানী শরীফ, আলআমন ওয়াল উলা- ২২৯)।

সবক ঃ হযরত মূসা আলাইহিস সালাম সেই বুড়ীকে শুধু জান্নাত নয় বরং জান্নাতে তাঁর সান্নিধ্যও দান করেছেন। জান্নাতের বেলায় হস্তক্ষেপ করার মত ক্ষমতা আল্লাহর মকবুল বান্দাগণের রয়েছে। তাই যারা নবীকূল সরতাজ আহমদ মুখতার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে ক্ষমতাহীন বলে, তারা বড় অজ্ঞ ও জাহিল।

কাহিনী নং- ৮৪

বনী ইসরাইলের পথভ্রষ্টতা

বনী ইসরাইলের লোকেরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সাথে ফেরাউন থেকে মুক্তি পেল। নদী অতিক্রম করার পর ওরা চলার পথে এমন এক মুর্তিপূজারী কউমকে দেখলো, যারা মূর্তিদের সামনে আসন পেতে বসে ওসব মুর্তিদের পূজা করছিল। মুর্তিগুলো গাভীর আকৃতিতে ছিল। এটা দেখে বনী ইসরাইলের লোকেরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে বললো, হে মূসা! এসব লোকদের খোদার মত আমাদেরকে একটি খোদা তৈরী করে দাও। হযরত মূসা

আলাইহিস সালাম ফরমালেন, ওহে মূর্খ; এটা কি বলছ ?এ মুর্তি পূজা তো ধ্বংসাত্মক এবং ওরা যা কিছু করছে, সম্পূর্ণ বাতিল। আমি কি তোমাদের জন্য এক আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য খোদার সন্ধান করবো? (কুরআন করীম ৯পারা, ৭ আয়াত)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলার এত মেহেরবানীর পরও যারা একে ভুলে যায় এবং মূর্তিদের সামনে মাথানত করতে আগ্রহী হয়ে যায়, ওদের পথভ্রষ্টতা ও মূর্খতা সম্পর্কে কি আর বলা যায়।

কাহিনী নং- ৮৫

স্বর্ণকার সামেরী

বনী ইসরাইলের মধ্যে সামেরী নামে এক স্বর্ণকার ছিল। সে সামেরা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ সম্প্রদায়ের লোকেরা গাভী আকৃতির মুর্তির পূজারী ছিল। সামেরী যখন বনী ইসরাইলের লোকদের সংশ্রবে আসলো, তখন সে বাহ্যিকভাবে মুসলমান হয়ে গেল। কিন্তু মনে মনে গাভী পূজার প্রতি আসক্তি ছিল। বনী ইসরাইলের লোকেরা নদী অতিক্রম করার পর মুর্তি পূজারী একটি কওমকে মুর্তি পূজা করতে দেখে মূসা আলাইহিস সালামকে তাদের জন্য অনুরূপ একটি মূর্তি তৈরী করে দিবার জন্য বলেছিল। এতে মূসা আলাইহিস সালাম নাখোশ হন। সামেরী ওদের এ আগ্রহ দেখে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তৌরাত কিতাব আনার জন্য যখন তুর পাহাড়ে তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন এ সুযোগে সামেরী অনেক স্বর্ণ অলংকার সংগ্রহ করে এগুলোকে গলায়ে একটি গো-বাছুর আকৃতির মূর্তি তৈরী করলো, অতঃপর সে কিছু মাটি সেই মুর্তির মধ্যে ঢুকায়ে দিল তখন মূর্তিটি গো-বাছুরের মত আওয়াজ করত লাগলো এবং ওটার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হলো। অতঃপর সামেরী বনী ইসরাইলের লোকদের দ্বারা সেই বাছুরের পূজা শুরু করায়ে দিল এবং ইসরাইলীরা সেই বাছুরের পূজারী হয়ে গেল। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড় থেকে ফিরে এসে তাঁর কওমের এ অবস্থা দেখে ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং সামেরীকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা তুমি কি করেছ? সামেরী বললো, আমি নদী পার হওয়ার সময় জিব্রাইলকে ঘোড়ার উপর আরোহিত দেখেছিলাম। আমি লক্ষ্য করলাম যে জিব্রাইলের ঘোড়ার পা যে জায়গায় পড়তেছিল, ওখানে সবুজ ঘাস গজিয়ে উঠতেছিল। আমি ঐ ঘোড়ার পায়ের জায়গা থেকে কিছু মাটি উঠায়ে নিয়ে ছিলাম এবং সেই মাটি গরুর বাচুরের আকৃতিতে তৈরী এ মূর্তির মধ্যে ঢুকায়ে দিয়েছি। এতে এটার মধ্যে প্রাণের সঞ্চার হয় এবং আমার কাছে এটা খুবই ভাল লেগেছে। আমি যা কিছু করেছি, ভালই করেছি । মূসা আলাইহিস সালাম ফরমালেন, আচ্ছা, তুমি যাও। আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। এখন থেকে দুনিয়াতে তোমার শাস্তি হচ্ছে, তুমি প্রত্যেককে বলবে আমাকে স্পর্শ কর না। অর্থাৎ তোমার এমন অবস্থা হবে যে তুমি কাউকে তোমার কাছে আসতে দিবে না। ঠিকই তার এ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল। যে কেউ ওকে স্পর্শ করলে, ওর ও

স্পর্শকারী উভয়ের ভীষণ জ্বর হয়ে যেতো এবং ওর ভীষন কষ্ট হতো। এ জন্য সামেরী নিজেই চিৎকার করে লোকদেরকে বলতো কেউ আমার গায়ে লাগিও না। লোকেরাও ওর থেকে দূরে সরে থাকতো, যেন জ্বরে আক্রান্ত হওয়া থেকে রক্ষা পায়। দুনিয়াবী এ আজাবে পতিত হয়ে সামেরী একেবারে একাকী হয়ে গেল এবং জন মানব শুন্য জংগলে চলে গেল। তথায় খুবই জিল্লতীর সাথে মারা গেল। (কুরআন করীম ১৬ পারা, ১৪ আয়াত, রুহুল বয়ান ৫৯৯ পৃঃ ২জি ঃ)

সবক ঃ আজও গো পূজারীরা তন্ত্র মন্ত্রের অধিকারী। ওরা মুসলামনদের থেকে আলাদা থাকতে চায়, মুসলমানদেরও ওদের থেকে দূরে সরে থাকা উচিত। জিব্রাইলের ঘোড়ার পায়ের মাটি থেকে যদি জীবনীশক্তি পাওয়া যায়, তাহলে যিনি জিব্রাইলেরও আকা ও মওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম এবং হুযূরের উম্মতের মধ্যে যারা আল্লাহর ওলী, ওনাদের পায়ের স্পর্শেই হাজার হাজার ফয়েজ বরকত কেন পাওয়া যেতে পারে না? নিশ্চয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু যারা গোমরাহএবং সামেরী থেকেও অধিক পাপী, ওরা আল্লাহ ওয়ালাদের ফয়েজ-বরকতের অস্বীকারকারী ।

কাহিনী নং - ৮৬

হত্যাকারী সনাক্তকরণ

বনী ইসরাইলে এক ধনী ব্যক্তি ছিল। ওকে ওর চাচাতো ভাই সম্পত্তির লোভে হত্যা করে শহরের বাইরে ফেলে দিল এবং নিজেই পরদিন সকালে ওর রক্তের দাবীদার হয়ে মাতম করতে লাগলো। লোকেরা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে আরয করলেন- আপনি দুআ করুন, যেন আল্লাহ তাআলা আসল কথা প্রকাশ করেন। তিনি বললেন, এ ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম হলো যে, একটি গাভী জবেহ কর এবং সেই গাভীর একটি টুকরা নিয়ে সেই নিহত ব্যক্তির উপর আঘাত কর। তখন যে জীবিত হয়ে নিজেই বলবে, ওর খুনী কে? লোকেরা এ কথা শুনে বিস্মিত হয়ে বললো, এটা রসিকতা নয় তো? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ফরমালেন, মাযল্লা! আমি কি এ রকম বেহুদা কথা বলবো। আমি একেবারে সত্যি কথাই বলছি। লোকেরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, গাভীটা কি রকম? হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ ফরমান, গাভীটা বেশী বয়স্কা নয়, আবার একেবারে অল্প বয়স্কাও নয়। বরং উভয়টার মাঝামাঝি। লোকেরা বললো, আল্লাহর কাছে এটাও জিজ্ঞেস করে নিন যে সেটার রংটা কি রকম। তিনি বললেন, আল্লাহ ফরমান, এমন জাফরানী রং এর গাভী, যার রং চক চক করে এবং দর্শকরা দেখে সন্তুষ্ট হয়। লোকেরা আবার বললো, গাভীটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটু বিস্তারিতভাবে বলে দিন। যেন সেই গাভীটা চিনতে আমাদের কোন ভুল না হয়। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহ ফরমান, এমন গাভী যেটা দিয়ে কোন কাজ করানো হয়নি,

যেটা দিয়ে না হালচাষ করা হয়েছে, না ক্ষেতে পানি দেয়া হয়েছে, গাভীটি হতে হবে দোষমুক্ত ও বেদাগী।

এবার ওরা ঐ ধরণের গাভী তালাশ করতে লাগলো। কিন্তু ঐ ধরণের গাভী পাওয়া দুষ্কর ছিল। তবে তাদের ভাগ্য ভাল ঐ ধরণের বৈশিষ্ট্যময় একটি গাভীর সন্ধান পেল। গাভীটি ছিল একটি এয়াতীম শিশুর। শিশুটির পিতা ছিল বনী ইসরাইলের একজন নেক্কার ব্যক্তি। ওর কাছে একটি গাভীর বাছুর ছাড়া শিশুটির জন্য রেখে যাবার মত আর কিছু ছিল না। সে বাছুরটির গলায় একটি চিহ্ন দিয়ে জংগলে ছেড়ে দিল এবং আল্লাহর দরবারে আরয করলো, হে আল্লাহ! আমি এ বাছুরটি আমার ছেলের জন্য তোমার কাছে আমানত রাখছি। আমার ছেলে বড় হলে এটা যেন ওর কাজে আসে। কালক্রমে নেক্কার লোকটা মারা গেল এবং বাছুরটি জংগলে লালিত পালিত হতে লাগলো।

ছেলেটা যখন বড় হলো, সেও বাপের মত নেক্কার হলো এবং আপন মায়ের বড় আনুগত্য ছিল। একদিন ওর মা বললো, বেটা, তোমার পিতা অমুক জংগলে তোমার জন্য একটি গো বাছুর ছেড়ে দিয়ে গেছে। এখন সেটা নিশ্চয় বড় হয়ে গেছে। সেটাকে জংগল থেকে নিয়ে এসো। মায়ের কথামত সে জংগলে গেল এবং মায়ের বর্ণিত লক্ষণ সমূহ দেখে নিজের গাভীকে চিনে ফেললো এবং আল্লাহর কসম দিয়ে ওটাকে ডাকলো। তখন গাভীটা সংগে সংগে সামনে হাজির হয়ে গেল। অতঃপর সে গাভীটি নিয়ে মায়ের কাছে আসলো, মা ওকে বললো, এটাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে তিন দীনার মূল্যে বিক্রি করে এসো , তবে কারো সাথে কথা হলে, পুনরায় আমার থেকে জিজ্ঞেস করে যেও। সেই যুগে একটি গাভীর মূল্য তিন দিনারের অধিক ছিল না। ছেলেটা গাভী নিয়ে বাজারে গেলে একজন ফিরিশতা খরিদদার সেজে এসে গাভীটির মুল্য ছয় দিনার বললো, তবে শর্ত জুড়ে দিল যে মায়ের কাছে অনুমতির জন্য যেতে পারবে না। এখানে দাঁড়িয়ে নিজেই বিক্রি করবে। কিন্তু ছেলেটি মায়ের দেয়া শর্তানুসারে ওকে জিজ্ঞেস করা ব্যতীত বিক্রি করতে রাজি হলো না। মায়ের কাছে গিয়ে ব্যাপারটা বললো।

মা ছয় দিনারে বিক্রি করার অনুমতি দিল কিন্তু দ্বিতীয় বার বিক্রির কথা চূড়ান্ত হলে মায়ের মতামত নেয়ার জন্য বলে দিল। ছেলে যখন পুনরায় বাজারে ফিরে আসলো, তখন সেই ফিরিশতা খরিদদার সেজে এসে গাভীটির মুল্য বার দিনার বললো তবে একই শর্ত জুড়ে দিল যে, মায়ের অনুমতির জন্য যেতে পারবে না। কিন্তু ছেলে মায়ের অনুমতি ছাড়া দিতে পারবে না বললো এবং মায়ের কাছে এসে সমস্ত ঘটনা বললো। মা বুঝে গেল, এ খরিদদার কোন ফিরিশতা হবে। মা ছেলেকে বললো এবার সেই খরিদদার আসলে ওকে জিজ্ঞস করবে, আমাকে এ গাভীটি বিক্রির অনুমতি দিবে কি না? ছেলেটি বাজারে এসে সেই খরিদদারকে যখন সেই কথাটি বললো, তখন সে বললো, এ গাভীটি এখন বিক্রি কর না। যখন বনী ইসরাইলের

লোকেরা ক্রয় করতে আসবে, তখন এর মুল্য বলবে যে এর চামড়া সোনা দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। ছেলে গাভীটি ঘরে নিয়ে আসলো। এটা এমন গাভী ছিল, যেটার মধ্যে আল্লাহ তাআলার বর্ণিত সমস্ত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিল। সেটার সন্ধানে ছিল বনী ইসরাইল। সুতরাং বনী ইসরাইলের লোকেরা খবর পেয়ে ওদের ঘরে আসলো এবং গাভীটির মূল্য এটাই ধার্য করা হলো যে, এর চামড়াকে স্বর্ণ দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। হযরত মূসা আলাইহিস সালামের জিম্মায় বনী ইসরাইলের লোকদের সেই গাভী দিয়ে দিল। ওরা গাভীটি জবেহ করে ওর মাংসের একটি টুকরা নিয়ে যখন সেই নিহত ব্যাক্তির লাশের উপর আঘাত করলো, তখন সে জীবিত হয়ে বলতে লাগলো, আমাকে আমার চাচাতো ভাই হত্যা করেছে। শেষ পর্যন্ত হত্যা কারীকে স্বীকার করতে হলো এবং ধরা পড়লো। (কুরআন করীম ১ পারা, ৮ ও ৯ আয়াত, রুহুল বয়ান ১০৯ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বর্ণিত গাভীর টুকরায় যদি এতটুকু বরকত হয় যে মৃত ব্যক্তির সাথে লাগলে জীবিত হয়ে যায়, তাহলে যারা আল্লাহর মকবুল বান্দা, তাদের অস্তিত্বের মধ্যে কেন লাখ লাখ বরকত ও কেরামত হবে না এবং ওদের ইশারায় মৃতদের জীবন নছিব কেন হবে না?

এটা বুঝা গেল যে, জালিম যতই গোপনীয়ভাবে জুলুম করুক না কেন, এটা কিছুতেই লুকায়ে রাখা যায় না। যেভাবে খোদায়ী হেকমত দ্বারা বনী ইসরাইলের নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর হদিস পাওয়া গেছে, সে ভাবে কাল কিয়ামতের দিন খোদায়ী হেকমতের দ্বারা প্রত্যেক জালিমের হদিস পাওয়া যাবে। এটাও বুঝা গেল যে, মায়ের অস্তিত্ব বড় নিয়ামত। ওর সন্তুষ্টি সাধন দ্বারা দ্বীন দুনিয়ার কল্যাণ সাধিত হয়। এটাও বুঝা গেল যে, গাভী কখনও উপাস্য হতে পারে না। আল্লাহই একমাত্র উপাস্য। বনী ইসরাইলের লোকেরা যেহেতু সামেরীর তৈরী গাভীর পূজা করেছিল, সেহেতু আল্লাহ তাআলা ওদের দ্বারাই একটি গাভী জবেহ করায়ে ছিলেন, যেন ওরা বুঝতে পারে যে, আসস উপাস্য তো সেই, যে এ গাভী জবেহ করার হুকুম দিল।

কাহিনী নং- ৮৭

হযরত মূসা ও খিজির আলাইহিস সালাম

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাইলের লোকদের সামনে একবার খুবই জ্ঞানগর্ব ওয়াজ করলেন। তখন তিনি এটাও বললেন যে, এখন আমিই হলাম সবচে বড় আলিম। মূসা আলাইহিস সালামের এ কথা আল্লাহর পছন্দ হলো না এবং হযরত মূসাকে বললেন, হে মূসা! তোমার থেকে বড় আলিম হচ্ছে আমার বান্দা খিজির। তখন মূসা আলাইহিস সালাম খিজিরের সাথে মুলাকাত করার আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আল্লাহর অনুমতি নিয়ে হযরত খিজিরের সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হয়ে পড়লেন। আল্লাহ সাহায্য করলেন এবং খিজির আলাইহিস সালামকে

পেয়ে গেলেন। মূসা আলাইহিস সালাম ওনাকে বললেন, আমি আপনার সংশ্রবে থাকতে চাচ্ছি যেন আপনার জ্ঞান ভান্ডার থেকে আমিও কিছু উপকৃত হতে পারি। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি আমার সাথে থাকলে এমন কিছু বিষয় দেখবেন, যেগুলোর ব্যাপারে আপনি ধৈর্যধারণ করতে পারবেন না। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমি ধৈর্য্য ধারণ করবো; আপনি আমাকে আপনার সাথে থাকতে দিন। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, আমার কোন কাজে আপনি প্রতিবাদ করতে পারবেন না। হযরত মূসা আলাইহসি সালাম এতে রাজি হয়ে গেলেন এবং ওনার সাথে অবস্থান করতে লাগলেন।

একদিন উভয়ে যাত্রাপথে একটি নৌকায় আরোহন করলেন। নৌকার মাঝি হযরত খিজির আলাইহিস সালামকে চিনতে পেরে ভাড়া নিলেন না। কিন্তু হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ওর নৌকার একটি অংশ ভেঙ্গে দিলেন এবং ত্রুটি যুক্ত করে দিলেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম এটা দেখে বলে উঠলেন, জনাব, আপনি এটা কি করলেন? বেচারা গরীব লোক, আমাদের থেকে ভাড়াও নিলনা। আপনি ওর নৌকাটা ভেঙ্গে দিলেন। হযরত খিজির বললেন, মূসা! আমি কি বলিনি যে, আপনি ধৈর্য্যধারণ করতে পারবেন না এবং আমার কাছে প্রতিবাদ করা ছাড়া থাকতে পারবেন না। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, এটা আমার ভুল হয়ে গেল। ভবিষ্যতে এ রকম আর হবে না। পুনরায় যাত্রা দিলেন. কিছু দূর যাবার পর রাস্তায় একটি ছেলের সাথে দেখা হল। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম ছেলেটিকে হত্যা করে ফেললেন। হযরত মূসা চিৎকার দিয়ে উঠলেন, হে খিজির! আপনি এটা কি করলেন? একটা শিশুকে অনর্থক মেরে ফেললেন? খিজির আলাইহিস সালাম বললেন, মূসা, আপনি আবার মুখ খুললেন, আমার সাথে আপনার অবস্থান সম্ভব নয়। মূসা আলাইহিস সালাম বললেন, আর একবার সুযোগ দিন। এবার যদি কোন কিছু বলি, আমাকে পৃথক করে দিবেন। সুতরাং পুনরায় যাত্রা দিলেন। পথ চলতে চলতে এমন এক গ্রামে গিয়ে পৌছলেন, যে গ্রামের বাসিন্দারা ওনাদেরকে কোন পাত্তা দিল না। এমনকি ওনারা খাবার চাইলে ওরা দিতে অস্বীকার করলো। ঐ গ্রামের একটি ঘরের দেয়াল ভেঙ্গে পড়ছিল। হযরত খিজির আলাইহিস সালাম নিজ হস্তে সেই দেয়ালটা সোজা করে ভালমতে স্থাপন করে দিলেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম অবলোকন করলেন যে, এ গ্রামের লোকেরা এত কৃপন যে ওনাদেরকে খাবার পর্যন্ত দিতে রাজি হলো না আর এ খিজির দয়াপরবশ হয়ে ওদের ঝুঁকে পড়া দেয়ালকে সোজা করার কাজে লেগে গেলেন। হযরত মূসা আলাইহিস সালাম আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, হে খিজির! আপনি চাইলে তো এ দেয়াল সোজা করা বাবত ওদের থেকে পারিশ্রমিক নিতে পারতেন, কেন বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে দিলেন? হযরত খিজির বললেন, এবার আর আপনাকে আমার সাথে থাকার সুযোগ দেয়া হবে না। তবে পৃথক হবার আগে সেই তিনটি ঘটনার রহস্য জেনে নিন। আমি যে লোকটার নৌকার সামান্য অংশ ফুটো করে দিয়ে ছিলাম, এর রহস্য হলো, নদীর অপর পারে এক জালিম বাদশাহ ছিল, যে প্রতিটি ত্রুটিমুক্ত নৌকা জোর

করে নিয়ে নিত। কিন্তু নৌকায় কোন ত্রুটি থাকলে নিত না। এটা নৌকার মাঝি জানতো না। আমি যদি নৌকার কিছু অংশ ফুটো করে না দিতাম, তাহলে সেই গরীব বেচারার নৌকাটা নিয়ে নিত। যে ছেলেটাকে আমি মেরে ফেলেছি, এর রহস্য হলো, ওর মা-বাবা মুসলমান ছিল। আমি দেখলাম যে, এ ছেলে বড় হয়ে কাফির হয়ে যাবে এবং ওর মা বাপও ওর মহব্বতে ইসলাম থেকে ফিরে যাবে। তাই আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলাম যে, তিনি যেন ওদেরকে ওর থেকে ভাল ছেলে দান করেন। তাই আমি ওকে মেরে ফেললাম যেন ওর মা-বাপ এ ফিত্না থেকে নিরাপদ থাকে। আর এ গ্রামের সে ঝুকে পড়া দেয়ালটা সোজা করে দেয়ার রহস্য হচ্ছে, দেয়ালটি ছিল শহরের দুটি অনাথ শিশুর। সেই দেয়ালের নিচে ছিল ওদের ধনাগার। ওদের পিতা বড় নেক্কার ব্যক্তি ছিল। তাই আল্লাহর এটা ইচ্ছা ছিল শিশুদ্বয় বড় হয়ে যেন এ সম্পদ ভোগ করতে পারে। এ ছিল রহস্যাবলী, যা আপনি দেখেছেন। (কুরআন করীম ১৬ পারা, ৩ আয়াত, রুহুল বয়ান ৪৯৪ পৃঃ, ১ জিঃ)

সবক ঃ ধর্মীয় বিষয় সমূহে নিশ্চয় কোন না কোন রহস্য নিশ্চয় থাকে এবং যত বড় আলেম হোক না কেন, জ্ঞান অন্বেষনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা চায়। আল্লাহর মকবুল বান্দাদের এ জ্ঞান থাকে যে, অমুক শিশু বড় হয়ে মুমিন হবে, না কি কাফির হবে। আল্লাহর মকবুল বান্দাগন যা ইচ্ছে করে, আল্লাহ তা-ই করে দেন। যেমন হযরত খিজির আলাইহিস সালাম সেই ছেলেটাকে হত্যা করে বলেছিলেন আমি আশা করি যে ওর মা-বাপকে আল্লাহ তাআলা ওর থেকে ভাল সন্তান দান করবেন। ঠিকই খিজির আলাইহিস সালামের বাসনা অনুযায়ী আল্লাহ তাআলা ওদেরকে ওর থেকে উত্তম সন্তান দান করেছেন।

কাহিনী নং-৮৮

পশু পাখীর ভাষা

এক ব্যক্তি হযরত মূসা আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হয়ে বললো, হুযুর, আমাকে পশু পাখীর ভাষা শিখায়ে দিন। এ বিষয়ে আমার খুবই আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তিনি ফরমালেন, তোমার এ আগ্রহ ভাল নয় তুমি এটা বাদ দাও। সে বললো, হুযুর! এতে তো আপনার কোন ক্ষতি নেই। আমার একটি মাত্র বাসনা। আপনি এটা পূর্ণ করে দিন।

মূসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে আরয করলেন, মওলা! এ লোকটি এ বিষয়ে বার বার বিরক্ত করছে। আমি কি করতে পারি, নির্দেশ দিন। আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিলেন- লোকটি যখন বিরত হচ্ছে না, ওকে পশু পাখীর ভাষা শিখায়ে দাও। অতএব হযরত মূসা আলাইহিস সালাম ওকে পশু পাখীর ভাষা শিখায়ে দিলেন।

লোকটির একটি মোরগ ও একটি কুকুর ছিল। একদিন খাবার খাওয়ার পর লোকটির চাকরানী

যখন দস্তরখানা ঝেড়ে ফেললো, তখন সেখান থেকে এক টুকরা রুটি পড়লো। লোকটার কুকুর ও মোরগ উভয়ই দৌড়ে আসলো সেই টুকরাটা খাওয়ার জন্য। কিন্তু টুকরাটি মোরগই পেয়ে গেল। তখন কুকুর মোরগকে বললো, আরে জালিম, আমি ক্ষুধার্ত, এ টুকরাটা আমাকে দিয়ে দিতে পারতে। তোমার খাদ্য তো শস্য দানা কিন্তু তুমি এ টুকরাটাও ছাড়লে না। মোরগ বললো, নিরাশ হয়ো না। কাল আমাদের মালিকের ষাড়টা মারা যাবে। তখন তুমি ওটার মাংস যা খুশি তা খেয়ে নিও। লোকটি এ কথা শুনে সংগে সংগে ষাড়টি বিক্রি করে দিল। পরদিন ঠিকই ষাড়টি মারা গেল। কিন্তু ক্ষতি হলো ক্রেতার এবং লোকটি ক্ষতি থেকে বেঁচে গেল। দ্বিতীয় দিন কুকুর মোরগকে বললো, তুমি বড় মিথ্যুক, আমাকে অনর্থক আশা দিয়ে রেখেছ। কৈ তোমার সেই ষাড়, যার মাংস খাওয়ার কথা বলছিলে? মোরগ বললো, আমি মিথ্যুক নই, আমাদের মনিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য ষাড়টা বিক্রি করে ফেলেছে এবং নিজের মছিবত অন্যের কাঁধের উপর চড়ায়ে দিয়েছে। তবে শুন, কাল আমাদের মুনিরের ঘোড়া মারা যাবে। তখন তুমি তৃপ্তি সহকারে এর মাংস খাইও। লোকটি একথা শুনে ঘোড়াটাও বিক্রি করে দিল। দ্বিতীয় দিন কুকুর অভিযোগ করলে মোরগ বললো, ভাই, কি বলবো, আমাদের মুনিব বড় বেঅকুপ। নিজের ক্ষতি নিজে ডেকে এনেছে। সে ঘোড়াটাও বিক্রি করে দিয়েছে এবং সেটা ক্রেতার ঘরে মারা গেছে। যদি ষাড় ও ঘোড়াটা নিজের ঘরে মারা যেত, তাহলে আমাদের মুনিবের জানের কাফ্ফারা হতো। কিন্তু ওগুলো বিক্রি করে নিজের জানের উপর বড় বিপদ ডেকে আনলো। শুন, নিশ্চিত জেনে নাও কাল আমাদের মুনিব নিজেই মারা যাবে। ওর কুলখানী উপলক্ষে যে খানাপিনার আয়োজন হবে ওখান থেকে তোমার ভাগ্যেও অনেক কিছু জুটবে।

একথা শুনে লোকটির আক্কেল গুরুম। এখন কি করবে কিছুই বুঝে আসতেছেনা। দৌড়ে হযরত মূসা আলাইহিস সালামের কাছে গেল এবং বললো, হুযুর! আমার ভুল ক্ষমা করুন। মৃত্যু থেকে আমাকে বাঁচান। মূসা আলাইহসি সালাম বললেন, বেঅকুপ। এটা এখন অসম্ভব। যা অবধারিত হয়ে গেছে, তা এখন আর হটানো যাবে না। আজ যে বিষয়টি তুমি জানতে পেরেছ, সেটা আমি ঐ দিনই অবলোকন করেছি, যেদিন তুমি পশুপাখীর ভাষা শিখার জন্য বিরক্ত করছিলে। এখন মৃত্যর জন্য প্রস্তুত থাক। ঠিকই পরদিন লোকটি মারা গেল। (মসলিম শরীফ)

সবক ঃ কারো ধন সম্পদের বেলায় যদি কোন বিপদ আসে এবং কোন প্রকারের ক্ষতি হয়, তাহলে দুঃখ বা হা-হুতাস করা অনুচিত। বরং নিজের জানের সদকা মনে করে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত। এটা মনে করা উচিত যে, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। যদি মালের উপর বিপদ না আসতো, তাহলে হয়তো জানের উপর আঘাত আসতো।

কাহিনী নং- ৮৯

ঘূর্ণি ঝড়

আদ জাতি খুবই প্রভাবশালী ছিল। এরা ইয়ামনের এক মরু অঞ্চলে বাস করতো। এরা পৃথিবীকে পাপাচারে সয়লাব করে দিয়েছিল এবং নিজেদের শক্তির দাপটে পৃথিবীর অন্যান্য জাতিকে তাদের সামনে মাথাউঁচু করে দাঁড়াতে দেয়নি। এরা মূর্তি পূজারী ছিল। তাদের হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তাআলা হযরত হুদ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করেন। তিনি যখন তাদেরকে তওহীদের কথা বললেন এবং জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন, তখন তারা তাঁর অস্বীকারী ও বিরোধীতাকারী হয়ে গেল এবং বলতে লাগলো আজ আমাদের থেকে অধিক শক্তিশালী আর কে আছে? কিছু লোক হযরত হুদ আলাইহিস সালামের উপর ঈমান এনেছিল তবে তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য ছিল।

এ জাতি যখন সীমা অতিরিক্ত অন্যায়-অবিচার ও পাপাচারে লিপ্ত হলো এবং আল্লাহর নবীর বিরোধীতা করলো, তখন উর্ধাকাশে একটি কালো রং এর মেঘ দেখা গেল, যেটা সম্পূর্ণ আদ জাতির উপর বিস্তৃত ছিল। ওরা মেঘটা দেখে দারুন খুশী হলো, কারণ ওদের পানির প্রয়োজন ছিল। তারা আশ্বস্ত ছিল যে এ মেঘ থেকে প্রচুর বৃষ্টি হবে। কিন্তু বৃষ্টির পরিবর্তে সেই মেঘ থেকে এমন এক জোরালো বাতাস প্রবাহিত হলো যেটা উট ও মানুষকে উড়ায়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে ওরা ঘরে প্রবেশ করে দরজা বন্ধ করে দিল। কিন্তু বাতাসের প্রবলগতি থেকে রক্ষা পেল না। ঘরবাড়ী মুছড়িয়ে সব ধ্বংস করে দিল। সব লোক মারা গেল, অতঃপর আল্লাহর কুদরীতে কিছু কালো পাখীর আর্বিভাব হলো। এ পাখীরা ওসব লাশগুলো উঠায়ে সমুদ্রে ফেলে দিল। হযরত হুদ আলাইহিস সালাম তাঁর মুষ্টিমেয় অনুসারীদেরকে নিয়ে ওদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।ফলে ওনারা ছহীহ -সালামতে ছিলেন। (কুরআন করীম ৮ পারা, ১৭ আয়াত,খাযায়েনুল এরফান ২৩১ পৃঃ রুহুল বয়ান ৭৩৭ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর অবাধ্যতা এবং তাঁর রসূলের নাফরমানীর একটি পরিণতি এটাও যে আগুন-পানি, মাটি-বাতাসও মানুষের জন্য আজাবে পরিণত হয়।

কাহিনী নং- ৯০

পাথরের উষ্ট্রী

আদ জাতি ধ্বংসের পর ছমুদ জাতির উদ্ভব ঘটে। হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে এদের বসতি ছিল। এদের আয়ুষ্কাল খুবই দীর্ঘ হতো। ওরা পাথরের যে মজবুত ঘর বানাতো, সেটার আয়ুষ্কাল পুরায়ে ভেঙ্গে যেত কিন্তু ওরা বহাল তরিয়তে থাকতো। এ কউমও যখন আল্লাহর

নাফরমানী শুরু করলো, তখন আল্লাহ তাআলা ওদের হেদায়েতের জন্য হযরত ছালেহ আলাইহিস সালামকে প্রেরণ করলেন। কিন্তু ওরা তাঁকে স্বীকার করলো না। মাত্র কিছু সংখ্যক গরীব লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। ওদের বছরান্তে এমন একটি দিন ছিল, যে দিন ওরা বিরাট মেলা করে আনন্দ প্রকাশ করতো। এ মেলায় অনেক দূর দরাজ থেকে লোক আসতো। মেলার দিন যখন আসলো, তখন লোকেরা হযরত ছালেহ আলাইহিস সালামকেও সেই মেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্য দাওয়াত করলো। হযরত ছালেহ আলাইহিস সালাম সত্য প্রচারের উদ্দেশ্যে সেই মেলায় তশরীফ নিয়ে গেলেন। ছমুদ জাতির গণ্যমান্য লোকেরা হযরত ছালেহ আলাইহিস সালামকে বললো, যদি আপনার খোদা সত্য হয় এবং আপনি যদি তাঁর রসূল হন, তাহলে আমাদেরকে কোন একটা মুজেজা দেখান। তিনি বললেন, তোমরা কি দেখতে চাও? ওদের সবচে বড় সরদার বললো, এযে সামনে যে পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে, আপনার খোদাকে বলুন সেখান থেকে এমন একটি বড় উষ্ট্রী বের করুক, যেটা দশমাসের গাভিন। হযরত ছালেহ আলাইহিস সালাম সেই পাহাড়ের নিকটে গিয়ে প্রথমে দু'রাকাত নামায আদায় করলেন, অতঃপর দুআ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সেই পাহাড়টি নড়ে উঠলো। এরপর পাহাড়টি ফেঁটে গেল এবং সবার সামনে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসলো, যেটা দশ মাসের গাভিন ছিল এবং তখনই একটি বাছুর প্রস্রব করলো, এ ঘটনা দেখে সবাই বিস্মিত হলো, কিন্তু অধিকাংশ ওদের কুফরীতে অটল রইলো। মাত্র কিছু সংখ্যক লোক মুসলমান হলো। (কুরআন করীম ৮ পাতা, ৭ আয়াত, রুহুল বয়ান ৭৬৮ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ নবীগণের মুজেজা বরহক এবং আল্লাহ তাআলা সবকিছুর বেলায় ক্ষমতাবান, নবীগণের মুজেজা অস্বীকার করা কাফিরদেরই কাজ।

আল্লাহ তাআলা হযরত আয়ুব আলাইহিস সালামকে সব রকমের নেয়ামত দান করেছিলেন। তাঁকে সুন্দর চেহারা, অধিক সন্তান এবং অধিক সম্পদ দান করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে মহা পরীক্ষায় ফেলেছিলেন। ঘর পড়ে তাঁর সব সন্তান-সন্তুতি মারা গিয়েছিল। তাঁর গৃহ পালিত পশু, যার মধ্যে হাজার হাজার উট ও হাজার হাজার ছাগল ছিল, সব মারা গিয়েছিল, সমস্ত ক্ষেত-খামার বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল। মোট কথা কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। এসব কিছুর ধ্বংস ও ক্ষতি হওয়ার খবর তাঁকে পৌছালে. তিনি আল্লাহর শোকর জ্ঞাপন করতেন এবং বলতেন, আমার কি, যার জিনিস তিনি নিয়ে গেছেন। যতদিন আমাকে দিয়ে ছিলেন এবং আমার হস্তগত ছিল, ততদিনের শোকরও আমি ঠিকমত আদায় করতে পারিনি। আমি আল্লাহর মর্জিতে সন্তুষ্ট। পরবর্তীতে তিনি রোগাক্রান্ত হন, তাঁর সমস্ত শরীরে ফোস্কা পড়লো, সমস্ত শরীর ক্ষত-

বিক্ষত হয়ে গেল। লোকেরা তাঁর সংশ্রব ত্যাগ করলো। একমাত্র মহিয়শী স্ত্রী ছাড়া আর কেউ তাঁর কাছে রইলো না। উনি তাঁর সেবাশুশ্রুষায় নিয়োজিত রইলেন। এভাবে অনেক দিন কেটে যাবার পর একদিন তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করলেন। আল্লাহ তাআলা ফরমালেন, হে আয়ুব! তুমি স্বীয় পা দিয়ে জমীনে আঘাত কর। তোমার পায়ের আঘাতে শীতল ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। এর পানি পান কর এবং এর দ্বারা গোসল কর। সেমতে আয়ুব আলাইহিস সালাম যখন জমীনে পা দিয়ে আঘাত করলেন, তখন পায়ের আঘাতে একটি শীতল ঝর্ণা প্রবাহিত হলো। তিনি সেই ঝর্ণার পানি দিয়ে গোসল করলেন এবং পানি পান করলেন। এতে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়ে গেলেন।

(কুরআন করীম ২৩ পাতা, আয়াত১২, খাযায়েনুল এরফান ৪৬৪ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ রোগ, শোক ও বলা মছিবতে পতিত হয়েও আল্লাহর শোকর আদায় করেন। কখনও এর জন্য অভিযোগ করেন না। আল্লাহর মকবুল বান্দাদের পায়েও বরকত রয়েছে। আয়ুব আলাইহিস সালাম পা দ্বারা মাটিতে আঘাত করায় এমন ঝর্ণা প্রবাহিত হলো, যেটার পানি শেফাদায়ক ছিল। যারা মবকুল বান্দাদের ফয়েজ বরকত অস্বীকার করে ওদের মত বদবখত ও জালিম আর কেউ নেই।

কাহিনী নং- ৯২

আজিমুশশান রাজত্ব

আল্লা তাআলা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে এক আজিমুশশান রাজস্ব দান করেছিলেন এবং বাতাসকে তাঁর অধীনস্থ করে দিয়েছিলেন। তিনি বাতাসকে যেখানে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিতেন, বাতাস তাঁর সিংহাসনকে উড়ায়ে ওখানে পৌছায়ে দিতেন। মানুষ, জ্বীন, পশু-পাখী সব তাঁর অধীন ও বাহিনীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। তিনি পশু-পাখীর ভাষাও জানতেন।

তিনি যখন বায়তুল মুকাদ্দসের নির্মাণ কাজ থেকে ফারেগ হলেন, তখন তিনি পবিত্র মক্কা মুয়াজ্জমায় যেতে মনস্থ করলেন। অতঃপর প্রস্তুতি শুরু হলো। তিনি মানুষ, জ্বিন, পাখী ও অনান্য জীব জন্তুকে তাঁর সাথে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দিলেন। অল্পসময়ের মধ্যে এক বিরাট বাহিনী প্রস্তুত হয়ে গেল। এ বাহিনী প্রায় ত্রিশ মাইল লম্বা ছিল। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম যখন বাতাসকে নির্দেশ দিলেন, তখন বাতাস এ বিশাল বাহিনীসহ সুলাইমান আলাইহিসা সালামের সিংহাসন উঠায়ে অল্পসময়ের মধ্যে মক্কা শরীফে পৌছায়ে দিল। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম কিছুদিন হেরেম শরীফে অবস্থান করলেন এবং এ সময় তিনি মক্কা শরীফে প্রতিদিন পাঁচ হাজার উট, পাঁচ হাজার গরু এবং বিশ হাজার ছাগল জবেহ করতেন এবং তাঁর বাহিনীকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর

আগমনের এ সুসংবাদ শুনাতেন যে, এখানে শেষ নবীর আগমন ঘটবে। এরপর আর কোন নবী আসবেনা।

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম মক্কা শরীফে কিছুদিন অবস্থানের পর হজ্বপর্ব আদায় করে একদিন সকালে ওখান থেকে ইয়ামনের সান্‌য়া নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। মক্কা শরীফ থেকে সান্‌য়া হচ্ছে এক মাসের পথ। কিন্তু তিনি সকালে রওয়ানা হয়ে দুপুরে তথায় পৌছে গেলেন। তিনি সেখানেও কিছুদিন অবস্থানের মনস্থ করলেন। সেখানে একদিন তাঁর বাহিনীর হুদহুদ পাখী উড়ান দিয়ে খুব উর্ধে উঠলো এবং ওখান থেকে সমগ্র পৃথিবীর দৈর্ঘ ও প্রস্থ অবলোকন করলো। এক নয়নাভিরাম সবুজ বাগান ওর চোখে পড়লো। এটা ছিল রানী বিলকিসের বাগান। সে আরও দেখলো যে, সেই বাগানে ওর মত আর এক হুদহুদপাখী বসা আছে। সোলাইমান আলাইহিস সালামের হুদহুদ পাখীর নাম ছিল ইয়াফুর। ইয়াফুর ইয়ামনী হুদহুদের কাছে গেল এবং তাদের মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হলো।

ইয়ামনী হুদহুদ ঃ ভাই, তুমি কোথায় থেকে এসেছ এবং কোথায় যাবে?

ইয়াফুর ঃ আমি সিরিয়া থেকে আমাদের বাদশাহ সোলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে এসেছি।

ইয়ামনী হুদহুদ ঃ সোলাইমান কে?

ইয়াফুর ঃ তিনি জ্বীন, মানুষ, শয়তান, পশু, পাখী ও বাতাসের এক মহান শক্তিশালী বাদশাহ। বাতাস হচ্ছে তাঁর বাহন এবং প্রত্যেক কিছু তাঁর আজ্ঞাবহ। আচ্ছা তুমি কোন্ দেশের পাখী ?

ইয়ামনী হুদহুদ ঃ আমি এ দেশেরই বাসিন্দা। আমাদের এদেশের বাদশাহ হচ্ছে একজন মহিলা, যার নাম বিলকিস। তার অধীনে বার হাজার সেনাপতি আছে এবং প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে এক এক লাখ সৈন্য আছে। অতঃপর সে ইয়াফুরকে বললো, তুমি আমার সাথে এ দেশ ও বাহিনী দেখতে যাবে?

ইয়াফুর ঃ ভাই, আমাদের বাদশাহ সোলাইমান আলাইহিস সালামের আসর নামাযের সময় ঘনিয়ে আসছে। ওযুর পানি প্রয়োজন হবে এবং পানির খোজখবর দেয়ার দায়িত্ব হচ্ছে আমার। তাই দেরী হলে তিনি অসন্তুষ্ট হবেন।

ইয়ামনী হুদুহুদ ঃ না, তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না। বরং এদেশের রানী বিলকিসের বিস্তারিত খবর শুনে খুব খুশী হবেন।

ইয়াফুর ঃ ঠিক আছে, তাহলে চল।

(উভয়ে উড়ান দিল এবং ইয়ামন রাজ্য দেখতে লাগলো)

এদিকে সোলাইমান আলাইহিস সালাম আসর নামাযের সময় হুদহুদকে তলব করলেন কিন্তু

ওকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, কি হলো, হুদহুদকে দেখছিনা কেন? নিশ্চয়ই সে অনুপস্থিত। আমি ওকে কঠিন শাস্তি দিব বা জবেহ করে ফেলবো, যদি সে কোন সুস্পষ্ট অজুহাত পেশ করতে না পারে।

অতঃপর তিনি একাব পাখীকে নির্দেশ দিলেন সে যেন উড়ে দেখে, হুদহুদ কোথায় আছে। নির্দেশমতে একাব পাখী উড়ে খুব উপরে উঠে সমগ্র পৃথিবীকে এমনভাবে দেখলো, যেভাবে মানুষ স্বীয় হাতের গ্রাসকে দেখে। হঠাৎ সে হুদহুদকে ইয়ামনের দিক থেকে উড়ে আসতে দেখলো। একাব সংগে সংগে ওর কাছে গিয়ে বললো, মহা বিপদ, কি করবে চিন্তা কর। আল্লাহর নবী হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তোমার ব্যাপারে এ বলে কসম করেছেন যে, আমি হুদহুদকে কঠিন শাস্তি দিব অথবা জবেহ করে ফেলবো।

হুদহুদ ভীত সন্ত্রস্ত মনে জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহর নবী তাঁর শপথে তারতম্য করার কি কোন অবকাশ রাখেন নি? একাব বললো, হ্যাঁ তিনি এটা বলেছেন "তবে যদি কোন সুস্পষ্ট অজুহাত আমার কাছে পেশ করতে পারে।"

হুদহুদ বললো, তাহলে আমি বেঁচে গেলাম। কারণ আমি এক দারুন সংবাদ নিয়ে এসেছি। অতঃপর একাব ও হুদহুদ উভয়ে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হলো। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম রাগতস্বরে বললেন, "হুদহুদকে হাজির কর"। বেচারা একান্ত বিনয়ী হয়ে, লেজ নিচু করে ডানা মাটির সাথে লাগিয়ে কম্পমান অবস্থায় সোলাইমান আলাইহিস সালামের নিকটবর্তী হলো। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম হুদহুদের মাথা ধরে জোরে টান দিলেন। এ সময় হুদহুদ বললো, হুযূর আল্লাহর সামনে আপনার হাজির হওয়ার কথা একবার স্মরণ করুন। সোলাইমান আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে ওকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমা করে দিলেন। অতঃপর হুদহুদ স্বীয় অনুপস্থিতির কারণ বর্ণনা করতে লাগলো, আমি এক বড় শানদার রানীকে দেখে এসেছি। আল্লাহ তাআলা ওকে আরাম আয়েশের সবধরণের জিনিসপত্র দান করেছেন। সে সূর্যের পূজা করে এবং ওর একটি বড় সিংহাসন আছে।

বর্ণিত আছে যে এ সিংহাসন সোনা ও চান্দির তৈরী এবং অনেক মূল্যবান মনিমুক্ত খচিত ছিল। বিলকিস এক মজবুত মহল তৈরী করিয়ে ছিল। সে ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় আর একটি ঘর ছিল। দ্বিতীয় ঘরের ভিতর তৃতীয় ঘর, তৃতীয় ঘরের ভিতর চতুর্থ ঘর, এভাবে সপ্তম ঘরে ওনার সিংহাসন স্থাপিত ছিল।এ সিংহাসনের উপর সাতটি মহামূল্যবান গিলাফ চড়ানো ছিল। এ সিংহাসনের চারটি পায়া ছিল। এর একটি ছিল লাল ইয়াকুত পাথরের দ্বিতীয়টি ছিল হলুদ ইয়াকুতের তৃতীয়টি ছিল সবুজ নমরুদের এবং চতুর্থটি ছিল সাদা মুক্তার। এ সিংহাসন আশি গজ লম্বা, চল্লিশ গজ চওড়া এবং ত্রিশ গজ উঁচু ছিল। বিলকিস সপ্তম ঘরে স্থাপিত সেই আজি মুশশান সিংহাসনে বসতো। প্রতি ঘরের বাইরে কড়া পাহারা ছিল। বিলকিস পর্যন্ত পৌছা খুবই কঠিন ছিল।

হুদহুদ যখন সোলাইমন আলাইহিস সালামকে বিলকিসের কথা শুনালো, তখন সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, আমার একখানা চিঠি ওর কাছে নিয়ে যাও। এ বলে তিনি একখানা চিঠি লিখলেন। সেটাতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখার পর লিখলেন, ان لا تعلو علىَ وانونى مسلمون (আমার ব্যাপারে অহংকার প্রকাশ কর না, মুসলমান হয়ে আমার সামনে হাজির হয়ে যাও) চিঠিতে সীলমোহর লাগিয়ে হুদহুদকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। নবীর এ পত্রবাহক পাহারাদারদের চোখে ফাঁকি দিয়ে সাত কিল্লা অতিক্রম করে ফটকের ছিদ্র দিয়ে বিলকিস পর্যন্ত পৌঁছে গেল। বিলকিস তখন নিদ্রামগ্ন ছিল। হুদহুদ চিঠিটা বিলকিসের বুকের উপর রেখে বের হয়ে আসলো। বিলকিস ঘুম থেকে উঠে এ চিঠি পেয়ে ঘাবড়িয়ে গেল এবং সভাসদের মতামত চাইলো যে এখন কি করা যায়। ওরা বললো, আপনি কেন ভয় করছেন, আমাদের কি শক্তি কম? আমরা যুদ্ধে পারদর্শী। সোলাইমান যদি যুদ্ধ করতে চায়, করুক। আমরা কিছুতেই পরাজয় মেনে নিব না, এখন আপনার মর্জি। বিলকিস বললো, যুদ্ধ ভাল নয়, কোন বাদশাহ যদি স্বীয় শক্তির দাপটে কোন শহরে জোর জবরদস্তি মুলক প্রবেশ করে, তখন সেই শহরকে ধ্বংস করে দেয়। আমার অভিমত হচ্ছে, আমি সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে বিছু তোহফা পাঠায়ে দেখবো যে তিনি সেটা গ্রহণ করে কিনা। যদি তিনি বাদশাহ হন, তাহলে তোহফা কবুল করবেন এবং যদি নবী হন, তাহলে তাঁর দীনের অনুসরণ ছাড়া এ তোহফা গ্রহণ করবেন না।

অতএব বিলকিস পাঁচ শ গোলাম, পাঁচশ দাসীকে উন্নতমানের পোষাক পরিচ্ছেদ ও মুল্যবান অলংকারে সাজিয়ে এমন ঘোড়ায় সওয়ার করালো যে গুলোর জ্বীনপোষ স্বর্ণের এবং লাগাম মনিমুক্তা খচিত ছিল। এদের সাথে এক হাজার স্বর্ণের ও চান্দির ইট, একটি মহামূল্যবান বড় বড় মুক্তা খচিত মুকুট ও অন্যান্য তোহফা সহ একজন দূত প্রেরণ করলো এবং সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে একখানা চিঠিও দিল।

হুদহুদ এটা দেখে তাড়াতাড়ি আগে ভাগে এসে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে এ খবর জানিয়ে দিল। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর জ্বীন বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যেন সোনা চান্দির ইট বানিয়ে সেই ইট দিয়ে ছয় মাইল ব্যাপী রাস্তা তৈরী করে এবং রাস্তার উভয় ধারে সোনা-চান্দির দেয়াল তৈরী করে এবং সমুদ্রে যে সব সুন্দর সুন্দর প্রাণী আছে, এবং স্থলের যে সব সুন্দর পশু আছে, সব এনে রাস্তার উভয় ধারে যেন দাঁড় করায়ে দেয়। নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা বাস্তবায়ন করা হলো। ছয় মাইল ব্যাপি সোনা-চান্দির সড়ক তৈরী হয়ে গেল। সড়কের উভয় ধারে সোনা-চান্দির দেয়ালও হয়ে গেল। জল ও স্থলের সুন্দর প্রাণী গুলোও এনে দাঁড় করায়ে দেয়া হলো। এরপর হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম তাঁর সিংহাসনের ডানদিকে চার হাজার এবং বাম দিকে চার হাজার স্বর্ণের চেয়ার স্থাপন করালেন এবং ওসব চেয়ারের উপর তার ঘনিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বসালেন। তাঁর জ্বীন ও মানব বাহিনীকে

অনেক দূর পর্যন্ত কাতার বন্দী করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বন্য জীব জন্তুগুলোকেও সড়কের উভয় ধারে দাঁড় করিয়ে দিলেন। মোট কথা এমন শাহী শান শওকত ও সমারোহ দুনিয়ার বুকে কেউ কখনো দেখেনি।

বিলকিসের দূতের ধারনা মতে সে অনেক মূল্যবান উপঢৌকন নিয়ে যচ্ছিল। কিন্তু যখন সে সোনা চান্দির তৈরী সড়কের উপর পা রাখলো, সড়কের উভয়ধারে সোনা-চান্দির দেয়াল দেখলো এবং সোলাইমান আলাইহিস সালামের শাহী শান শওকতের দৃশ্য দেখলো, তখন ওর বুক কাঁপতে লাগলো এবং লজ্জায় একেবারে মাথানত হয়ে গেল। মনে মনে ভাবতে লাগলো বিলসিকের এ উপঢৌকন কিভাবে সোলাইমান আলাইহিস সালামের খেদমতে পেশ করবো। যাহোক, যখন সে সোলাইমান আলাইহিস সালামের শাহী দরবারে উপস্থিত হলো, তখন সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, তোমরা কি দুনিয়াবী জিনিস দ্বারা আমার সাহায্য করতে চাচ্ছ? তোমরা অহংকারী, দুনিয়াকে নিয়ে গর্ব কর, একে অপরের হাদিয়া তোহফা আদান প্রদানে সন্তুষ্ট হও। কিন্তু আমি দুনিয়াবী তোহফা দ্বারা উল্লাসিত হই না। আমার এর প্রয়োজনও নেই। আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন, যা অন্য কাউকে দেননি। তাছাড়া তাঁর দীন ও নাবুয়াত দ্বারা আমাকে ধন্য করেছেন। অতএব হে বিলকিসের দূত, তুমি তোমর আনীত উপঢৌকন ফিরায়ে নিয়ে যাও এবং ওকে গিয়ে বলিও, সে যদি মুসলমান হয়ে আমার সামনে হাজির না হয়, তাহলে আমি এমন সেনাবাহিনী পাঠাবো, যার মুকাবিলা করার ক্ষমতা ওর নেই এবং আমি ওকে নাজেহাল করে শহর থেকে বের করে দিব।

বিলকিসের দূত এ পয়গাম নিয়ে ফিরে আসলো এবং বিলকিসকে সম্পূর্ণ ঘটনা জ
ানালো। বিলকিস গভীর মনোযোগ সহকারে সবকিছু শুনে বললো, নিশ্চয় তিনি আল্লাহর নবী। তাঁর সাথে মুকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। অতঃপর যে, তাঁর সাম্রাজ্যের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে পরামর্শ করার পর সিদ্ধান্ত নিল যে সে নিজেই সোলাইমান আলাইহিস সালামের খেদমতে হাজির হবে। হুদহুদ এ খবরটা সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে পৌছায়ে দিল। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম ভরপুর দরবারে ঘোষণা করলেন ایکم
يا تينى بعرشها قبل .

অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছ, যে বিলকিস এখানে পৌছার আগে তার সিংহাসন এখানে নিয়ে আসতে পার? আফরিয়াত নামে এক জ্বীন দাঁড়িয়ে বললো,

انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك অর্থাৎ আপনার মজলিস শেষ হবার আগেই আমি নিয়ে আসবো। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, আমি এর থেকেও তাড়াতাড়ি আনাতে চাই।

তখন আর এক পারদর্শী জ্বীন উঠে বললো انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك আমি এক পলক পাড়ারও আগে নিয়ে আসব। এ কথা বলার পর পলক পড়ার আগেই নিয়ে আসলো।

সোলাইমান আলাইহিস সালাম দেখলেন যে, সিংহাসন তাঁর সামনে রাখা হয়েছে। এরপর বিলকিস যখন সোলাইবান আলাইহিস সালামের বারগাহে উপস্থিত হলো এবং তাঁর শান শওকত ও নাবুয়তের সত্যতার প্রমাণ পেল, তখন মুসলমান হয়ে গেল। (হায়াতুল হায়ওয়ান ৩০৫ পৃঃ ২ জিঃ রুহুল বায়ান ৮৯৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ (১) হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের দরবার ও বিলকিসের সিংহাসনের অবস্থানের দুরুত্ব ছিল দু'মাসের পথ। সিংহাসনের দৈর্ঘ-প্রস্থ ও উচ্চতা সম্পর্কে ইতিপূর্বে জে নেছেন যে, এর উচ্চতা ত্রিশ গজ, প্রস্থ চল্লিশ গজ এবং আশি গজ লম্বা ছিল। এত দীর্ঘ পথের দূরত্ব এত ভারী ও নিরাপদ স্থানে রক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সোলাইমান আলাইহিস সালামের মাত্র একজন সৈনিক যদি চোখের পলকে সেই সিংহাসন সোলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে নিয়ে আন্‌তে পারে, তাহলে সোলাইমান আলাইহিস সালামের আকা ও মওলা সৈয়্যদুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লামের ওলীগণ দূর দরাজ থেকে কোন মজলুমের সাহায্যে কেন এগিয়ে আসতে পারবেন না?

(২) সেই পারদর্শী জ্বীন কিলকিসের প্রাসাদে গেল এবং ওখান থেকে সিংহাসন উঠায়ে ফিরে এলো। কিন্তু এ সময় সে হযরত সোলাইমানের দরবার থেকে অদৃশ্যও হলো না, আবার বিলকিসের সিংহাসনের সেখানেও পৌঁছে গেল। এতে বুঝা গেল যে, আল্লাহ ওয়ালাগণের এমন ক্ষমতা আছে যে, একই সময় বিভিন্ন জায়গায় হাজির হতে পারেন। এ ক্ষমতা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের একজন নগণ্য সৈনিকের মধ্যেও রয়েছে। তাই যিনি হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামেরও আকা ও মওলা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ওনার বেলায় একই সময় বিভিন্ন জায়গায় তশরীফ আনাটা কেন অসম্ভব হবে?

(৩) হযরত সোলাইমান আলাইহি সালামের সেই সৈনিক যদি দু'মাসের পথ এক পলকে অতিক্রম করতে এবং পুনরায় ফিরে আসতে পারে, তাহলে সৈয়্যেদুল আম্বিয়া হুযূর (সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর পক্ষে শবে মেরাজে এক পলকে আরশের উপর যাওয়া ও ফিরে আসা কেন সম্ভব নয়?

(৪) বিশাল বাহিনীসহ হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামকে বাতাস বহন করে নিয়ে যেত। এটা ছিল নবীর হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা। যারা নবীগণকে নিজেদের মত মানুষ বলে, তাদের মধ্যে কেউ যেন স্ত্রীসহ ছাদ থেকে বাতাসের উপর লাফ দিয়ে দেখায়, যাতে অন্যদের শিক্ষা লাভ হয়।

(৫) হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম হেরেম শরীফে পৌঁছার পর প্রতিদিন পাঁচ হাজার উট, পাঁচ হাজার গরু এবং বিশ হাজার ছাগল জবেহ করাতেন। কিন্তু আজকাল এমন এক ফেরকা বের হয়েছে, যারা হজ্বের সময় একটি ছাগল কুরবানী করাকেও অপব্যয় বলে এবং মুসলমানগণকে এ শরয়ী কাজ থেকে বাঁধা দেয়।

(৬) মানব-দানব, পশু-পাখী জল ও স্থলের প্রাণী সমূহ এবং আল্লাহর অন্যান্য শক্তিশালী মখলুকও সোলাইমান আলাইহিস সালামের অনুগত ছিল। আজ যারা নবীগণকে নিজে-দের মত মানুষ বলে, তাদের ঘরের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন যে, ওদের স্ত্রীরাও ওদের অনুগত নয়।

কাহিনী নং-৯৩

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের ফয়সালা

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের আদালতে দু'ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলেন যে, ওদের একজনের ছাগলগুলো রাত্রে অন্য জনের ক্ষেত্রে ঢুকে সমস্ত ক্ষেত খেয়ে ফেলেছে। তাই তারা এ ব্যাপারে ন্যায় বিচার চায়। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম রায় দিলেন যে, সমস্ত ছাগল যেন ক্ষেতের মালিককে ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিয়ে দেয়া হয়। ছাগল গুলোর মূল্য ক্ষেতের বরাবর ছিল। এ রায় নিয়ে ওরা ফেরার পথে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের সাথে দেখা হয় এবং ওরা প্রদত্ত রায়ের কথা ওনাকে জানালো। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, এ রায় থেকেও উত্তম অন্য একটি রায় দেয়া যায়। ঐ সময় হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের বয়স ছিল মাত্র এগার বছর। হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম যখন হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের এ কথা শুনলেন তখন তিনি ওনাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, বেটা, সেটা কোন্ ধরণের রায়, যেটা তোমার কাছে উত্তম মনে হচ্ছে? হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, সেটা হচ্ছে-ছাগলের মালিক সেই ক্ষেতকে নতুন ভাবে গড়ে তুলবে এবং ক্ষেত যতদিন ছাগলের খাওয়ার আগের অবস্থায় ফিরে না আসবে, ততদিন ক্ষেতের মালিক ছাগলগুলোর দুধ ইত্যাদি ভোগ করবে। ক্ষেত আগের মত হয়ে গেলে ছাগলের মালিককে ফেরত দিয়ে দিবে। এ রায় দাউদ আলাইসি সালামও পছন্দ করলেন। (কুরআন করীম ১৭ পারা, ২ আয়াত, রুহুল বয়ান ২৫২ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম ও হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের এ দু'টি রায় ইজতেহাদী মূলক ছিল। ইজতেহাদ করা নবীগণের সুন্নাত।

কাহিনী নং- ৯৪

মায়ের মমতা

হযরত দাউদ আলাইহিস সালামের যুগে দু' মহিলা এক সাথে কোথাও যাচ্ছিল। উভয়ের কোলে শিশু সন্তান ছিল। পাথিমধ্যে হঠাৎ একটি নেকড়ে বাঘ এসে বড়জনের শিশুটি ধরে নিয়ে যায়। সে তখন ছোট জনের শিশুটি কেড়ে নিয়ে বললো, এটা আমার শিশু। তোমার শিশু

বাঘে নিয়ে গেছে। শিশুর মা বললো, বোন, আল্লাহকে ভয় কর। এ শিশুতো আমার। বাঘ তোমার বাচ্চাকেই নিয়ে গেছে। কিন্তু সে মানতে রাজি না । শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে যখন ঝগড়া বেড়ে গেল এবং কোন মিমাংসা হলো না, তখন উভয়ে হযরত দাউদ আলাইহিস সালামর কাছে বিচার দিলেন। দাউদ আলাইহিস সালাম আসল মায়ের পক্ষে কোন দলীল না পাওয়ায় শিশুটা অপর মহিলাকে দিয়া দিলেন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম এ রায়ের কথা শুনে দরবারে এসে বললেন, আব্বাজান! অনুমতি পেলে আমিও একটি রায় দিতে পারি। সেটা হচ্ছে, আমাকে একটি ছুরি এনে দিন। আমি এ শিশুকে দু টুকরা করে উভয়কে ভাগ করে দিব। এ রায় শুনে বড়জন নিশ্চুপ রইলো কিন্তু ছোট জন বললো, হুযুর! বাচ্ছাটা ওকে দিয়া দিন, আল্লাহর ওয়াস্তে ওকে দু টুকরা করবেন না। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বললেন, শিশুটা এ ছোট জনেরই যার আন্তরে মাতৃস্নেহ সৃষ্টি হয়েছে। অতএব শিশুটা ছোট জনকে দিয়া দিলেন। (ফতহুল বারী ২৬৮ পৃঃ, ১২ জিঃ, মিশকাত শরীফ ৫০০ পৃঃ)

সবক ঃ ইজতিহাদের মাধ্যমে বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

কাহিনী নং- ৯৫

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম ও আযরাইল ফিরিশতা

হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের দরবারে এক ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্থ অবস্থায় উপস্থিত হয়ে আরয করতে লাগলো, হুযুর বাতাসকে নির্দেশ দিন আমাকে যেন হিন্দুস্থানে পৌছায়ে দেয়। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? এখান থেকে কেন চলে যেতে চাচ্ছ? সে বললো, হুযুর! এ মাত্র আমি আযরাইল ফিরিশতাকে দেখেছি। সে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। ঐ দেখুন, সে এখনও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। হুযুর জানিনা কি করে, মেহেরবানী করে আমাকে এক্ষুনি হিন্দুস্থানে পাঠিয়ে দিন। হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালাম বাতাসকে নির্দেশ দিলেন। বাতাস সঙ্গে সঙ্গে ওকে হিন্দুস্থানে পৌছিয়ে দিল।

কিছুক্ষন পর আযরাইল ফিরিশতা হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের কাছে এসে আরয করলেন। হুযুর! আপনি কি সেই লোকটার কাহিনী জানেন? আল্লাহ তাআলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে হিন্দুস্থানে সেই লোকটার জান কবজ করার জন্য। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না যে, হিন্দুস্থানে গিয়ে ওর জান কবজ করতে বলা হলো, অথচ সে আপনার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাই আমি আর্শ্চাম্বিত হয়ে ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম আর সে নিজেই হিন্দুস্থানে যাবার জন্য আগ্রহী হলো। আপনি

বাতাসকে হুকুম করলে, বতাস ওকে উড়ায়ে হিন্দুস্থানে নিয়ে গেল। এদিকে আমিও ওর পিছে পিছে গেলাম। যে মাত্র সে হিন্দুস্থানের মাটিতে অবতরণ করলো, তখন ওর মৃত্যুর সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই তখনই ওখানে ওর জান কবজ করে নিলাম। (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ মৃত্যু থেকে পালানো মুশকিল। যেখানে পালিয়ে যাও না কেন, এর থেকে রক্ষা নেই।

কাহিনী নং- ৯৬

স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে

হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের যুগে এক বাদশাহ ছিল। যার স্ত্রী ছিল বৃদ্ধা। সেই বৃদ্ধার আগের স্বামীর এক যুবতী কন্যা ছিল। বৃদ্ধার মনে ভয় হলো যে, সেতো বৃদ্ধা হয়ে গেল। বাদশাহ যদি অন্য মহিলাকে বিবাহ করে, তাহলে তো ওর দাপট থাকে না। তাই নিজের মেয়েকে বাদশাহর সাথে বিবাহ দেয়াটাই উত্তম মনে করলো। হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে ডেকে এ ব্যাপারে মতামত চাইলে তিনি বলেন, এ বিবাহ হারাম, জায়েয নেই। এ কথায় সেই কুটিল বৃদ্ধার মেজাজ খুবই বিগড়িয়ে গেল এবং তাঁর দুশমন হয়ে গেল এবং রাত দিন তাঁকে কতল করার চিন্তায় মগ্ন রইলো। একদিন সুযোগ পেয়ে বাদশাহকে মদ পান করায়ে নিজের মেয়েকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাদশাহর কাছে একাকিত্বে পাঠিয়ে দিল। বাদশাহকে যখন ওর মেয়ের প্রতি আকৃষ্ট দেখলো, তখন বৃদ্ধা বললো আমি আনন্দে এটাকে সমর্থন করছি। কিন্তু বাধ সেজেছে ইয়াহিয়া। বাদশাহ হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন এ তোমার আপন মেয়ের মত তোমার জন্য হারাম। বাদশাহ, জাল্লাদকে হুকুম দিল ইয়াহিয়াকে কতল কর। সঙ্গে সঙ্গে জল্লাদ হযরত ইয়াহিয়াকে শহীদ করে দিল। শহীদ হওয়ার পরও হযরত ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামের মস্তক মুবারক থেকে এ আওয়াজ বের হচ্ছিল-হে বাদশাহ! এ মহিলা তোমার জন্য হারাম, তোমার জন্য হারাম, তোমার জন্য হারাম। (সীরাতুস সোয়ালেহীন ৮০ পৃঃ)

সবক ঃ ফাসেক ও পাপিষ্ট শাসক স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা পূর্ণ করার জন্য বড় বড় জুলুমের আশ্রয় নেয় এবং ফাসেক ও পাপিষ্ট মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্য আল্লাহর প্রিয়জনদের সাথে জঘন্য আচরণ করে আর আল্লাহ ওয়ালাগণ হক পয়গাম পৌছানোর বেলায় জান কুরবান করতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

কাহিনী নং- ৯৭

তেরশ বছর বয়স্ক বাদশাহ

হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম একদিন জংগলের ভিতর দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি

একটি গুম্বুজ দেখলেন। সেখান থেকে আওয়াজ আসলো, হে দানিয়াল! এদিকে এসো। তিনি গুম্বুজের কাছে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, এটা কোন মাজারের গুম্বুজ। যখন তিনি মাজারের ভিতর গেলেন, তখন এক সুন্দর প্রাসাদ দেখলেন, প্রাসাদের মাঝখানে এক আলিশান সিংহাসন এবং সিংহাসনের পাশে এক বিরাট লাশ পতিত অবস্থায় দেখলেন। পুনরায় গায়বী আওয়াজ হলো, হে দানিয়াল! সিংহাসনের উপরে এসো। তিনি যখন উপরে তশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন তিনি লাশের পাশে একটি লম্বা চাওড়া তলোয়ার দেখলেন। সেটার উপর এ লেখাটুকু ছিলঃ

আমি আদ কউমের বাদশাহ ছিলাম। আল্লাহ তাআলা আমাকে তেরশ বছর হায়াত দান করেছিলেন। আমি বার হাজার বিবাহ করেছিলাম। আট হাজারের মত সন্তান হয়েছিল এবং আমার কাছে অগণিত ধন সম্পদ ছিল। এত নেয়ামত পেয়েও আমি আল্লাহর শোকর করেনি বরং কুফরী করতে থাকে ও খোদায়ী দাবী করতে লাগলাম। আল্লাহ তাআলা আমার হেদায়েতের জন্য একজন নবী পাঠালেন, তিনি আমাকে সব দিক দিয়ে বুঝালেন, কিন্তু আমি ওনার একটি কথাও মানিনি। শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে চলে গেলেন। আল্লাহ তাআলা আমার উপর ও আমার দেশের উপর অভাব অনটন চাপিয়ে দিলেন। যখন আমার দেশে কোন কিছু উৎপন্ন হলো না, তখন অন্যান্য দেশে অর্ডার দিলাম, যেন সব রকমের খাদ্যশস্য ও ফলমূল আমার দেশে প্রেরণ করে। অর্ডার মুতাবিক সব রকমের খাদ্যশস্য, ফলমূল প্রেরিত হলো কিন্তু আমার দেশের সীমানায় পৌছা মাত্র মাটি হয়ে গেল। সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল কোন শস্যদানা আমার ভাগ্যে জুটলোনা। এভাবে সাতদিন অতিবাহিত হলো। পরিবার-পরিজন সবাই আমার কাছ থেকে পালিয়ে চলে গেল। আমি প্রাসাদে একাই পড়ে রইলাম। ক্ষুধা ছাড়া আমার কাছে আর কিছু রইল না। একদিন আমি ক্ষুধার তাড়নায় একান্ত বাধ্য হয়ে প্রাসাদের দরজায় এসে দাঁড়ালাম। তখন দেখতে পেলাম, জনৈক ব্যক্তি কিছু খাদ্য দ্রব্য নিয়ে খেয়ে খেয়ে যাচ্ছে। আমি ওকে বললাম, আমার থেকে এক বড় থালা ভরে মনিমুক্ত নিয়ে যাও এবং তোমার থেকে আহারের দানাগুলো আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু সে আমার কথা শুনলো না। বরং আহারের দানাগুলো খেয়ে আমার সামনে থেকে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমি এ অনাহারের কষ্টে মৃত্যুমুখে পতিত হলাম। এটা আমার অনুরোধ, যে ব্যক্তি আমার এ করুন অবস্থার কথা শুনে, সে যেন কক্ষনো দুনিয়ার মোহে পতিত না হয়। (সীরাতুস সালেহীন ৭৯ পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ তাআলা থেকে যে কোন নেয়ামত প্রাপ্তির পর এর নাশোকরী করাটা চুড়ান্ত অপরিমানদর্শীতার পরিচায়ক। আল্লাহর নাশোকরীর দ্বারা অভাব-অনটন, দুর্ভিক্ষ ও নানা ধরণের বালা-মসিবত নাজিল হয়। মানুষ যত দীর্ঘ জীবন ধারণ করুক না কেন, এক দিন না এক দিন নিশ্চয় মৃত্যুবরণ করতে হবে।

কাহিনী নং-৯৮

অস্থায়ী দুনিয়া

বনী ইসলাইলের এক নওজোয়ান দরবেশের কাছে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম আসা যাওয়া করতেন। এ খবর তৎকালীন বাদশাহ জানতে পেরে সেই নওজোয়ানকে তলব করলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি সত্য যে, তোমার কাছে হযরত খিজির আলাইহিস সালাম নাকি আসা-যাওয়া করে? সে বললো, হ্যাঁ। বাদশাহ বললেন, এবার যখন আসবেন, আমার কাছে নিয়ে আসবে। না আনলে তোমাকে হত্যা করে ফেলবো। পরবর্তীতে খিজির আলাইহিস সালাম যখন তশরীফ আনলেন, তখন তিনি সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে বললেন- চলো, বাদশাহের কাছে যাই। অতঃপর তিনি বাদশাহের নিকট তশরীফ নিয়ে গেলেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, আপনিই কি খিজির? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বাদশাহ বললেন, তাহলে আমাকে কোন একটা আশ্চর্য জনক ঘটনা শুনান। তিনি বললেন, আমি দুনিয়ার অনেক আশ্চর্য ঘটনা দেখেছি। এর মধ্যে থেকে মাত্র একটি ঘটনা আপনাকে শুনাচ্ছিঃ

আমি একবার খুবই সুন্দর ও জনবহুল এক বিরাট শহর অতিক্রম করার সময় ঐ শহরের একজন বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম- এ শহর কখন গড়ে উঠেছে? সে বললো, এ শহর অনেক পুরানো, এর সূচনা আমার জানা নেই। আমার বাপ-দাদারাও জানেন না। আল্লাহ জানেন, কখন থেকে এ শহর এভাবে চলে আসছে। পুনরায় পাঁচশ বছর পর আমি যখন সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন ওখানে শহরের কোন নাম নিশানাও পেলাম না। একটি জংগল দেখতে পেলাম এবং সেখানে একজন লোক লাকড়ী সংগ্রহ করতে ছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম- এ শহর কখন বিরানা হয়ে গেল? সে আমার কথা শুনে হাসলো এবং বললো, এখানে শহর ছিল কখন? এ জায়গাতো দীর্ঘ কাল থেকে জংগলই আছে। আমাদের পূর্বপুরুষ থেকেও এ ধরণের কথাতো কোন দিন শুনিনি। আবার পাঁচশ বছর পর যখন ঐ জায়গা দিয়ে গেলাম, তখন ওখানে প্রবাহমান এক বিরাট নদী দেখতে পেলাম এবং নদী কিনারে কয়েকজন মৎস্য শিকারী বসাছিল। আমি ওদেরকে জিজ্ঞেস করলাম- এখানকার জংগল কখন থেকে নদীতে পরিণত হলো? ওরা আমার দিকে তাকিয়ে বললো আপনি যে রকম মানুষ, সে রকম প্রশ্ন করলেন। এখানেতো সব সময় নদীই ছিল। আমি বললাম, এর আগে কি এখানে জংগল ছিল না? ওরা বললো- কখনো নয়, আমরা তো দেখেনি, আমাদের বাপ-দাদাদের মুখ থেকেও এ ধরণের কথা কখনও শুনিনি। পুনরায় পাঁচশ বছর পর ঐ জায়গাকে এক বিরাট মরুভূমিতে রূপান্তরিত দেখলাম। একজন লোককে ওখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম - এ জায়গা কখন থেকে শুক্না হয়ে গেল? সে বললো, এ জায়গাতো সব সময় এ রকমই ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে কি কখনো নদী ছিল না? সে বললো, এ রকম তো কখনো দেখিনি এবং বাপ-দাদাদের মুখেও শুনেনি। আবার পাঁচশ বছর ঐ জায়গা দিয়ে যখন

যাচ্ছিলাম, তখন দেখতে পেলাম, এক বিরাট শহর গড়ে উঠেছে। সেটা আগেরটা থেকেও অধিক সুন্দর ও জনবসতীপূর্ণ ছিল। আমি ওখানকার একজন বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ শহর কবে হলো? সে বললো এটা খুবই পুরানো শহর। এর সূচনা সম্পর্কে আমার জানা নেই। আমার বাপ-দাদারাও জানেন না। (আজায়েবে মখলুকাত ১২৯ পৃঃ ১ জিঃ)।

সবক ঃ এ দুনিয়ার কোন স্থায়ীত্ব নেই। এটা হাজার রং ধারন করে। কোন সময় উত্থান, কোন সময় পতন, কোন সময় দুঃখ, কোন সময় আনন্দ।

কাহিনী নং-৯৯

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ও আয়না

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের এক বন্ধু তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি ওনাকে বলেন, ভাই, বন্ধুর কাছে বন্ধু আসলে কিছু তোহফা নিয়ে আসে। তুমি আমার জন্য কি এনেছ? বন্ধু বললেন, এ সময় পৃথিবীতে তোমার থেকে অধিক সুন্দর ও সুশ্রী কোন জিনিস নেই, যা আমি তোমার জন্য আনতে পারি। তাই আমি তোমার জন্য তোমাকেই এনেছি। ইউসুফর জন্য ইউসুফই তোহফা এনেছি, এ বলে একটি আয়না ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে রেখে দিলেন এবং বললেন, এতে তোমার সৌন্দর্যের অপরূপ দৃশ্য অবলোকন কর। এর থেকে বড় তোহফা আর কি হতে পারে? (মসনবী শরীফ)

সবক ঃ মানুষের উচিত, সে যেন নিজের আত্মাকে আয়নার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার করে নেয় এবং কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা যখন জিজ্ঞাসা করবেন, আমার জন্য কি এনেছ তখন যেন এ স্বচ্ছ আত্মাকে পেশ করে এবং আরয করে, হে আল্লাহ! আমি আপনার জন্যএ আত্মা এনেছি, যার মধ্যে আপনারই জলওয়া (দ্যুতি) রয়েছে।

কাহিনী নং ১০০

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুবই সুন্দর ও সুশ্রী ছিলেন। তাঁর বয়স যখন এগার বছর, তখন তিনি একটি স্বপ্ন দেখলেন যে, আসমান থেকে এগারটি নক্ষত্র মর্তে অবতরণ করেছে এবং ওগুলোর সাথে চাঁদ-সূর্য ও নেমে এসেছে। সবাই তাঁকে সিজদা করলো। তিনি এ স্বপ্নের কথা তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে ব্যক্ত করলেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বপ্নের তাবীর বুঝে গেলেন যে, হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবুয়াত লাভ করে ধন্য হবেন এবং তাঁর এগার ভাই তাঁর আনুগত্য স্বীকার করবেন।

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে খুবই মহব্বত করতেন। এ মহব্বতের কারণে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইগণের মনে ইউসুফের প্রতি বিরূপ ভাব ছিল। এটা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জানতেন। এ জন্য তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বললেন, বেটা! এ স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদরকে কক্ষনো বল না। পাছে তারা তোমার সাথে ষড়যন্ত্র করতে পারে। সেই দিন থেকে ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মহব্বত আরও বৃদ্ধি পেল।

ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইদের কাছে এটা বড় অসহ্যনীয় ছিল, তারা পরস্পর মিলে পরামর্শ করলো যে, এমন কিছু করা দরকার যাতে আব্বাজানকে আমাদের দিকে অধিক আকৃষ্ট করা যায়। ঐ পরামর্শ বৈঠকে শয়তানও হাজির হলো এবং সে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে হত্যার পরামর্শ দিল ও এটা সিদ্ধান্ত হলো যে, যে কোন উপায়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জংগলে নিয়ে গিয়ে কোন গভীর কূপে যেন ফেলে দেয়া হয়। অতঃপর ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা এক জোট হয়ে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের নিকট গিয়ে বললো, আব্বাজান! এটা কোন্ ধরণের কথা, আপনি ইউসুফ আলাইহিস সালামকে আমাদের সাথে থাকতে দেন না এবং আমাদের উপর আদৌ ভরসা করেন না অথচ আমরা ওর একান্ত শুভাকাঙ্খী। কাল ওকে আমাদের সাথে ঘুরা ফেরা করার জন্য পাঠিয়ে দিন। আমরা এদিক সেদিক ঘুরায়ে নিয়ে আসবো। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। সে আমাদের হেফাজতে থাকবে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, তোমাদের উপর আমার ভরসা হয় না। আমার ভয় হচ্ছে, তোমাদের সাথে গেলে, তোমাদের অবহেলায় ওকে কোন নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলে কিনা। ওরা বললো, ছিঃ ছিঃ আব্বাজান, আমাদর বর্তমানে ওকে বাঘে খাবে! তাহলে আমরা কিসের জন্য? আপনি ভয় করবেন না। ওকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন। অতএব ওরা জোর দেয়ায় ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ওদের সাথে দিয়ে দিলেন এবং হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কামিছ মুবারক যেটা জান্নাতের তৈরী, সেটা তাবিজ বানিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের গলায় দিয়ে দিলেন। উল্লেখ্য যে, যে সময় হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কাপড় খুলে ওনাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম সেই কামিছটি তাঁকে পরায়ে ছিলেন। সেই কামিছ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম থেকে হযরত ইসহাক আলাইহিস সালাম এবং তাঁর থেকে তাঁর আওলাদ হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম লাভ করেছিলেন।

ইয়াকুব আলাইহিস সালামের সামনে খুবই মহব্বত করে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কাঁধের উপর উঠায়ে নিল এবং যখন একটু দূরবর্তী এক জংগলে পৌছলো, তখন ইউসুফ আলাইহিস

সালামকে মাটিতে ফেলে ওদের মনে যা ক্ষোভ ছিল, তা প্রকাশ করতে লাগলো, যে যেদিকে পারে, ওকে মারতে লাগলো এবং সেই স্বপ্নের কথা, যেটা ওরা কোন উপায়ে শুনে গিয়েছিল, উল্লেখ করে ওনাকে নানাভাবে তিরস্কার করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, এটাই তোমার স্বপ্নের তাবীর। অতঃপর ওনাকে এক গভীর ও অন্ধকার কূপে বড় নিষ্ঠুরতার সাথে ফেলে দিল এবং তাদের ধারণা মতে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মেরে ফেললো।

(কুরআন করীম ১২পারা, ১২ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩২৬ পৃঃ)

সবক ঃ কোন ভাই এর ইজ্জত সম্মান ও উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হওয়া উচিত নয়। এ ধরণের মনোভাবের পরিণতি ভাল হয় না। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম জানতেন যে ইউসুফ আলাইহিস সালাম নবী হবেন এবং এটাও জানতেন যে, ওনার ভাইয়েরা ওনার সাথে ভাল আচরণ করবেনা। ভাইয়েরা ফিরে এসে যে অজুহাত পেশ করেছিল যে, ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে এটাও ইয়াকুব আলাইহিস সালামের জানা ছিল। এ জন্যই তিনি বলেছিলেন, ইউসুফকে তোমাদের সাথে পাঠাতে আমার ভয় হচ্ছে, পাছে যদি ওকে বাঘে খেয়ে ফেলে। আল্লাহ ওয়ালাগণের কাপড়ও বিপদ আপদের সময় নাজাতের সহায়ক এবং তাবিজ বানিয়ে গলায় দেয়া নবীগণের সুন্নাত।

কাহিনী নং - ১০১

উজ্জল কামিছ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন ওনার ভাইয়েরা একটি গভীর কূপে নিক্ষেপ করলো, তখন জিব্রাইল আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলা হুকুম করলেন, হে জিব্রাইল! সিদরাতুল মুনতাহা থেকে এ মূহূর্তে উড়ান দাও এবং ইউসুফ কূপের নিচে পৌছার আগেই তোমার পালকে উঠায়ে নাও এবং খুবই আরামের সাথে সেই পাথরের উপর বসায়ে দাও, যেটা কূপের এক কিনারে রয়েছে। নির্দেশ মতে জিব্রাইল আমীন চোখের পলকে ওখানে পৌছে গেলেন এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে স্বীয় পালকের উপর নিয়ে আরামের সাথে সেই পাথরের উপর বসায়ে দিলেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কামিছ, সেটা ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাবিজ বানিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের গলায় দিয়েছিলেন, সেটা খুলে ওনাকে পরায়ে দিলেন। এর ফলে অন্ধকার কূপ আলোকিত হয়ে গেল। (রুহুল বয়ান ১৪৭ পৃঃ, ২ জিঃ, খাযায়েনুল এরফান ৩৩৬ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের কামিছ মুবারক দ্বারা যদি অন্ধকার কূপ আলোকিত হয়ে যায় অর্থাৎ একজন নবীর কামিছও যদি নূর হয়, তাহলে সৈয়্যেদুল আম্বীয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম) কেন নূর শ্রেষ্ঠ নূর হবেন না এবং তাঁর নূরানী অস্তিত্ব দ্বারা কেন অন্ধকার দুনিয়া আলোকিত হবে না?

কাহিনী নং- ১০২

প্রতারনা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা ওনাকে গভীর অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করার পর ওনার কামিছ মুবারক যেটা কূপে ফেলার সময় ওনার শরীর থেকে খুলে নেয়া হয়েছিল, সেটা ছাগলের রক্তে রঞ্জিত করে সাথে নিয়ে আনলো। বাড়ীর কাছাকাছি পৌছার পর ওনারা মায়াকান্না শুরু করলো। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ওদের এ অভিনয় দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আমার ছেলের কি হল, ইউসুফ কোথায়? ওরা কেঁদে কেঁদে বললো, আব্বাজান, আমরা একে অপরের সাথে দৌড়াদৌড়ি করতে ছিলাম। কার থেকে কে বেশী দৌড়াতে পারে, এ প্রতিযোগীতায় আমরা অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। ইউসুফকে আমরা আমাদের জিনিসপত্রের কাছে বসায়ে রেখেছিলাম। সে একাকী সেখানে বসাছিল। একটি নেকড়ে বাঘ এ সুযোগে ওকে খেয়ে ফেলছে, এটা ওর রক্তে রঞ্জিত কামিছ। আব্বাজান! আমরা জানি, আপনি আমাদের কথায় আস্থা রাখবেন না। কিন্তু আসলে ঘটনা এটাই হয়েছে। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, ছেলেরা! এটা তোমাদের বানানো কথা। যাহোক আমি ধৈর্য ধারণ করবো এবং আল্লাহ তাআলার কাছেই এর বিচার চাইবো।

(কুরআন করীম ১২ পারা, ১২ আয়ত, খাযায়েনুল এরফান ৩৩৬ পৃঃ)

সবক ঃ জালিম স্বীয় জুলুম লুকানোর জন্য বিভিন্ন প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে এবং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য কাঁন্নাকাটি করেও দেখায়। তাই প্রত্যেক ক্রন্দনকারী সত্যবাদী নয়। কামিছকে নকল রক্তে রঞ্জিত করে আসল রক্ত বলাটাও জালিয়াতী। ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এটা জানা ছিল যে আমার ছেলে ইউসুফকে বাঘে খায়নি। বরং এটা ওদের মনগড়া বানানো কথা। যেখানে ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা অভিনয়মুলক কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন, সেখানে আল্লাহর নবী হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ধৈর্যের পরাকাষ্টা দেখালেন। যেন এটাই প্রমানিত হয় যে ক্রন্দন নয়, ধৈর্য প্রদর্শনই হক।

কাহিনী নং- ১০৩

ভাগ্যবান কাফেলা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ওনার ভাইয়েরা জংগলের অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে চলে গেল এবং ওরা মনে করেছিল যে ইউসুফ মারা গেছেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফকে কূপে নিরাপদে রাখলেন। তিন দিন পর্যন্ত তিনি সেই কূপে ছিলেন। এ কূপ আবাদী

থেকে অনেক দূরে জংগলে ছিল এবং এর পানি সীমাহীন লবণাক্ত ছিল। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের বরকতে সেটা মিটা পানি হয়ে গিয়েছিল। একদিন ঐ স্থান দিয়ে এক কাফেলা যাচ্ছিল। এ কাফেলা মদয়ান থেকে মিশর যাচ্ছিল। এ কাফেলা সেই কূপের কাছে যাত্রা বিরতি করলো। কাফেলার একজন লোককে সেই কূপ থেকে পানি আনার জন্য পাঠালো। যখন সে কূপে বালতি ফেললো, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম সেই বালতি ধরে ফেললেন এবং এর সাথে লটকে রইলেন এবং বালতির সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামও কূপ থেকে বের হয়ে আসলেন। বালতি নিক্ষেপকারী এ দৃশ্য দেখে এবং হযরত ইউসুফের সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে ও একান্ত আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাথীদেরকে চিৎকার করে বলে উঠলো, দেখ দেখ কূপ থেকে এক অপূর্ব সুন্দর ছেলে বের হয়ে এসেছে। ইউসুফ আলাইহিস সালামের ভাইয়েরা যারা কূপের কাছে ছাগল চড়াতে ছিল, তারা এ চিৎকার শুনে দৌড়ে আসলো এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জীবিত দেখে কাফেলার প্রধানকে বললো, এ আমাদের গোলাম। আমাদের থেকে পালিয়ে এসেছে। কোন কাজের নয়, আপনারা যদি ক্রয় করতে চান, খুব সস্তায় বিক্রি করে দেব, এরপর আপনারা একে এমন দূরে নিয়ে যাবেন, যেন আমরা ওর কোন খোঁজ খবর না পাই।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওনাদের ভয়ে নিশ্চুপ ছিলেন। অতঃপর তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে অল্পমূল্যে কাফেলার হাতে বিক্রি করে দিল এবং কাফেলা তাঁকে তাদের সাথে মিশরে নিয়ে গেল। (কুরআন শরীফ ১২ পারা ১২ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৩৭ পৃঃ)

সবক ঃ রাখে আল্লাহ্, মারে কে? ক্ষতির শত চেষ্টা করলেও ওটাই হয়ে থাকে, যেটাতে আল্লাহর অনুমোদন রয়েছে। আল্লাহওয়ালাগণের বরকতে লবনাক্ত পানি মিঠা হয়ে যায়।

কাহিনী নং ১০৪

প্রদীপ ও উৎসর্গিত পতঙ্গ সমূহ

হযরত ইউসুফের ভাইয়েরা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে অন্ধকার কূপে ফেলে দিল। আল্লাহতালা ওনাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। এক ভাগ্যবান কাফেলা ঐদিক দিয়ে যাবার পথে কূপ থেকে পানি উঠাতে গেলে, বালতির সাথে ইউসুফ আল্লাইহিস সালাম বের হয়ে আসেন এবং কাফেলার ভাগ্য তাঁরা চমকিয়ে উঠলো। এ ভাগ্যবান কাফেলা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিশর নিয়ে যায়। মিশরে যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনন্য সৌন্দর্যের খবর ছড়িয়ে পড়ে, তখন হাজার হাজার লোক সাত সকালে কাফেলা প্রধানের বাড়ীতে ভীড় জমায়। কাফেলা প্রধান ঘরের ছাদে উঠে দরাজ গলায় বললো, আপনারা এখানে কি জন্য এসেছেন? ওরা বললো, আপনার কাছে যে কেনানী গোলাম আছে, আমরা ওকে দেখার জন্য এসেছি। কাফেলা প্রধান বললো, ঠিক আছে, তবে ওকে দেখতে চাইলে একটি করে স্বর্ণ মুদ্রা দিতে হবে। সবাই এ শর্ত মেনে নিল এবং ঘরের দরজা খুলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করল। কাফেলা প্রধান দরজা

খুলে দিল এবং ঘরের আঙ্গিনায় একটি চেয়ারে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বসায়ে দিল। প্রত্যেকে এক একটি স্বর্ণ মুদ্রা ইউসুফ আলাইহিস সালামের পায়ের কাছে রেখে তাঁর দর্শন লাভে ধন্য হলো। এভাবে দু' দিনে কাফেলা প্রধানের হাজার হাজার স্বর্ণ মুদ্রা অর্জিত হলো। তৃতীয় দিন সে ঘোষনা দিল যে, যে ব্যক্তি এ কেনানী গোলাম ক্রয় করতে ইচ্ছুক, সে যেন আজ মিশরের বাজারে উপস্থিত হয়। এ ঘোষনা শুনে প্রত্যেকে তাঁকে ক্রয় করার জন্য আগ্রহী হলো। সমস্ত মিশর বাসী তাঁকে এক নজর দেখার জন্য ছুটে আসলো। এমন কি পর্দানশীন মহিলা, ধর্ম পরায়ন বৃদ্ধ ও নির্জনবাসীরাও তাঁকে দেখার আগ্রহে মিশরের বাজারে ধর্না দিল। স্বয়ং আজিজ মিসরও রাজভান্ডার নিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ক্রয় করার জন্য মিশরের বাজারে উপস্থিত হলেন। (সীরাতুস সোয়ালেহীন - ১৪৬পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহর মকবুল ও পুরস্কৃত বান্দাগণ সৃষ্টিকূলের আর্কষন হয়ে থাকে। এ দুনিয়া তাঁদের পদতলে লুটিয়ে পড়ে। তাঁদের বদৌলতে অন্য লোকের অন্নের সংস্থান হয়। আর যারা ভন্ডামী করে আল্লাহর মকবুল বান্দাদের মত হতে চায়, তারা বড় জাহিল ও মূর্খ।

কাহিনী নং ১০৫

মিসরের শাহজাদী

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যখন মিশরের বাজারে বিক্রি করতে আনা হলো এবং হাজার হাজার নারী পুরুষ বিভোর হয়ে ঝাপিয়ে পড়লো, তখন ফারেগা নামি মিশরের এক শাহজাদী গাধার পিঠে অনেক ধন-দৌলত নিয়ে হযরত ইউসুফকে খরিদ করতে আসলো। যখন ওর দৃষ্টি হযরত ইউসুফের উপর পতিত হলো, তখন ওর চক্ষু ঝলসিয়ে গেল এবং বিভোর হয়ে বলে উঠলো, হে ইউসুফ! আপনি কে? আপনার রূপ ও সৌন্দর্য দেখে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি। আপনাকে ক্রয়ের জন্য আমি যে ধন-দৌলত নিয়ে এসেছি, আপনাকে দেখে বুঝতে পারলাম যে, এসব ধন সম্পদ আপনার একটি পায়ের মূল্যও হবে না। আপনাকে এত সুন্দর করে কে বানালো? হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনিই আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমার আকৃতিকে এত সুন্দর করেছেন, যা দেখে তোমরা আশ্চর্য হয়ে গেছ। একথা শুনে সেই রমনী বললো, হে ইউসুফ! আমি সেই জাতে পাকের উপর ঈমান আনলাম, যিনি আপনার মত সুন্দর মখলুক সৃষ্টি করেছেন। আপনি তাঁর সৃষ্টি হয়ে এত সুন্দর, জানিনা সৃষ্টিকর্তার সৌন্দর্যের কি অবস্থা হবে। এ বলে সেই মহিলা তার আনিত সমস্ত জিনিস পত্র আল্লাহর পথে গরীব মিস্‌কীনকে দিয়া দিল এবং সব কিছু ত্যাগ করে আসল মাহবুবের সন্ধানে লেগে গেল। (সীরাতুস সোয়ালেহীন ১৪৮পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগনের বদৌলতে আল্লাহকে পাওয়া যায়। আল্লাহ ওয়ালাগনের সৌন্দর্য দেখে আল্লাহর কথা স্মরণ আসে। যাদেরকে দেখে গান্ধীর কথা স্মরণ আসে, তারা যদি ওসব পূন্যাত্মাগনের অনুরূপ বলে মনে করে, এর থেকে বড় হাস্যকর বিষয় আর কি হতে পারে?

কাহিনী নং ১০৬

আজিজ মিসর

যে সময় ইউসুফ আলাইহিস সালামকে মিসরের বাজারে আনা হয়েছিল, সে সময় মিসরের বাদশা ছিল আয়ান ইবনে ওলিদ আমলিকী। সে তার রাজত্বের লাগাম কতফির মিসরীর হাতে দিয়ে রেখেছিল। সমস্ত রাজকোষ ওর অধীনে ও কর্তৃত্বাধীনে ছিল। ওকে আজিজ মিসর বলা হতো এবং সে বাদশাহর উজীরে আযম ছিল। যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বাজারে বিক্রির জন্য আনা হলো, তখন প্রত্যেকের মনে তাঁকে পাওয়ার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি হলো। ক্রেতারা প্রতিযোগিতা করে দাম বাড়াতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত তাঁর ওজন বরাবর সোনা এবং সেই পরিমান চান্দি, মেশ্‌ক ও রেশমী বস্ত্র মূল্য ধার্য হলো। তাঁর ওজন ছিল চারশ রতল (পাঁচ মন) এবং তাঁর বয়স ছিল তের বছর। আজিজ মিসর তাঁকে সেই মূল্যে ক্রয় করে নিলো এবং নিজ ঘরে নিয়ে আসলো। অন্যান্য খরিদ দারেরা ওর মুকাবিলায় নিশ্চুপ হয়ে গেল। (খাযায়েনুল এরফান-৩৩৭পৃঃ)

সবক ঃ বড় বড় রাজা বাদশাহও আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত ও মকবুল বান্দাদের কাছে ধর্না দেয় এবং তাদের মূখাপেক্ষী হয়ে থাকে। ওরা কি করে আল্লাহ ওয়ালাদের মত হওয়ার দাবী করে, যাদের স্ত্রীরাও ওদেরকে পাত্তা দেয়না?

কাহিনী নং-১০৭

জুলেখা

জুলেখা খুবই সুন্দরী মহিলা ছিলেন। তিনি ছিলেন, তাইমুস বাদশাহের কন্যা। তিনি এক রাত্রে এক অপূর্ব সুন্দর যুবককে স্বপ্ন দেখলেন এবং ওকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে জবাব দিল আমি আজিজ মিসর। জুলেখার মনে এ স্বপ্নটা ভীষন রেখাপাত করলো এবং সর্বক্ষন সেই স্বপ্নটা তাঁর মনে জাগরুক রইলো।

বড় বড় বাদশাহের পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব আসলো, কিন্তু তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে বলে দিলেন যে, তিনি আজিজ মিসর ব্যতীত অন্য কাউকে বিবাহ করবেন না। অতএব শাহ তাইমুস আজিজ মিসরের সাথে স্বীয় কন্যার বিবাহ দিয়া দিলেন।

জুলেখা আজিজ মিসরকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন। কারন তাঁর স্বপ্নের পুরুষের সাথে এর কোন মিল নেই। যাহোক কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পর আজিজ মিসর হযরত ইউসুফকে ক্রয় করে ঘরে আনলে জুলেখা ওনাকে তাঁর স্বপ্নের আকৃতির অনুরূপ দেখতে পেলেন এবং তাঁর প্রেমে অস্থির হয়ে গেলেন।

মনোবাসনা পূর্ন করার জন্য তিনি একটি মনোরম মহল তৈরী করালেন, যার মধ্যে সাতটি কামরা ছিল। মহলটাকে খুবই সুন্দরভাবে সাজালেন এবং নিজেও খুবই সাজগোজ করে

একদিন কোন এক বাহানায় ইউসুফ আলাইহিস সালামকে সেই মহলে নিয়ে আসলেন। প্রথম কামরায় প্রবেশ করা মাত্র সেটার দরজা বন্ধ করে দিয়ে দ্বিতীয় কামরায় নিয়ে গেলেন এবং সেটার দরজাও বন্ধ করে দিয়ে তৃতীয় কামরায় নিয়ে গেলেন। এভাবে তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কামরা বন্ধ করে সপ্তম কামরায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। হযরত ইউসুফ এ অবস্থা দেখে বিশ্মিত হয়ে গেলেন। সেই সময় সেই কামরার ছাদ ফেটে গেল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখতে পেলেন যে, হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম স্বীয় আঙ্গুল দাঁতে কামড়ে ধরে বলছেন, বেটা! খবরদার! যেন সামান্যতম কুধারণা পর্যন্ত না আসে।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলেখাকে বললেন, আল্লাহকে ভয় কর এবং এ পবিত্র মহলকে অপবিত্র করো না এবং আমার প্রতি আসক্ত হয়োনা। জুলেখা তাঁর কথা শুনলেন না, সীমাহীন আসক্ত হয়ে পড়লেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম যখন অবস্থা বেগতিক দেখলেন, তিনি বের হয়ে আসতে চেষ্টা করলেন। জুলেখাও তাঁর পিছু নিলেন। তিনি যেই কামরার দরজার সামনে আসলেন, সেটির দরজার তালা এমনিতে খুলে গেল।

জুলেখা তাঁর পিছনে পিছনে দৌঁড়ে এসে তাঁর কোর্তা মুবারক ধরে পিছন দিক থেকে টান দিলেন, যেন তিনি বের হতে না পারেন। কিন্তু তাঁকে ধরে রাখতে পারলেন না। তিনি বের হয়ে আসলেন। এ টানাটানির সময় আজিজ মিসর দরজার বাইরে দাঁড়ানো ছিল। তিনি উভয়কে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখে ফেললেন। জুলেখা নিজেকে নির্দোষ ও ইউসুফ আলাইহিস সালামকে দোষী করার ফন্দী এঁটে স্বীয় স্বামীকে বলতে লাগলেন, যে আপনার স্ত্রীর প্রতি অশালীন আচরণ করে, তার কি শাস্তি হওয়া চাই? আমি ঘুমাচ্ছিলাম, সে এসে আমাকে কুপ্রস্তাব দেয়। ওকে বন্দী কর বা অন্য কোন শাস্তি দাও। হযরত ইউসুফ আলাইহিস বললেন, এটা মিথ্যা কথা। বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত। সে নিজেই কুকর্মে ফুস্‌লায়েছিল আর বদনাম করছে আমার। আজিজ মিসর বললেন এর প্রমান কি? ঐ কামরায় জুলেখার মামার এক দুগ্ধপোষ্য শিশু ছিল, যার বয়স হয়েছিল মাত্র তিন মাস, সে দোলনায় শোয়া ছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, সেই শিশুকে জিজ্ঞেস করুন। আজিজ মিসর বললেন, তিন মাসের শিশুকে কি জিজ্ঞেস করবো এবং এ কি বলবে? ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আল্লাহতাআলা একে কথা বলার শক্তি দানে এবং আমার সত্যতা প্রমাণে সক্ষম। আজিজ মিসর সেই শিশুকে জিজ্ঞেস করলে, সে সুস্পষ্ট কণ্ঠে বললো, ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরিহিত কোর্তাটি দেখে নাও। যদি সেই কোর্তার সাম্‌নের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহলে জুলেখা সত্যবাদী আর যদি পিছনের দিকে ছেঁড়া হয়, তাহলে ইউসুফ আলাইহিস সালাম সত্যবাদী। তদন্ত করে দেখা গেল যে কাপড় পিছন দিকে ছেঁড়া।এটার দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছিল যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলেখা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল আর জুলেখা তাঁর পিছু নিয়েছিল। এজন্য কোর্তার পিছন দিক ছেঁড়া। আজিজ মিসর এ বাস্তব লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলেন যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম সত্যবাদী। অতঃপর তিনি ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিলেন। (কুরআন শরীফ পারা ১২ আয়াত ১৩। রুহুল বায়ান ১৫৭ ও ১৫৮পৃঃ)

সবক ঃ নবীগণ মাছুম হয়ে থাকেন, ছোট-বড় সব ধরণের গুনাহ থেকে তাঁরা পবিত্র। মানুষ

যখন আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহর পথে ধাবিত হয়, তখন পথের সমস্ত বাধা বিঘ্ন অনায়াসে বিদূরীত হয়ে যায়। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর প্রিয় সন্তান হযরত ইউসুফের অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁর জানা ছিল যে, এখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম কোথায় আছেন এবং এ সময় তিনি কোন্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। আল্লাহ ওয়ালাগণ বাহ্যিকভাবে যত দূরেই থাকুন না কেন, কিন্তু কারো কোন বিপদের সময় সাহায্য করার জন্য পৌঁছে যান। আল্লাহতাআলা তাঁর নৈকট্য প্রাপ্ত বান্দাগনের সহায়তার জন্য তিন মাসের শিশুকেও বাকশক্তি দান করেন এবং তাঁর পবিত্র বান্দাগনের পবিত্র চরিত্রে সামান্যতম খুঁত লাগতে দেন না।

কাহিনী নং-১০৮

সৌন্দর্যের প্রভাব

জুলেখা হযরত ইউসুফের প্রেমে স্বীয় হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে ছিলেন। তাঁর এ প্রেমের কথা সারা মিসরে ছড়িয়ে গেল। অভিজাত ঘরের মহিলারা বলাবলি করতে লাগলো যে জুলেখা একটি যুবকের প্রেমে বিভোর হয়ে স্বীয় মান মর্যাদা, লজ্জা-শরমের কোন তোয়াক্কা করলো না। জুলেখা যখন তাঁর সম্পর্কে এ সব সমালোচনা শুনলেন, তখন একটি দাওয়াতের আয়োজন করলেন এবং এতে মিসরের অভিজাত পরিবারের চল্লিশ জন মহিলাকে দাওয়াত দিলেন। দাওয়াত কৃত মহিলাদের মধ্যে ওসব মহিলারাও ছিল, যারা জুলেখার সমালোচনা করতো। জুলেখা ওদের বসার জন্য প্যাণ্ডেল তৈরী করালেন। একান্ত ইজ্জত সম্মানের সাথে ওদেরকে বসালেন এবং ওদের সামনে দস্তরখানা বিছায়ে নানা রকম খাবার ও ফলমূল রাখলেন। অতঃপর প্রত্যেক মহিলার হাতে একটি চাকু দিলেন, যেন ওটা দ্বারা মাংস ও ফল কেটে খায়। এদিকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে উন্নত পোষাক পরিধান করায়ে বললেন, আপনি অল্পক্ষনের জন্য ওসব মহিলাদের সামনে গিয়ে ওদেরকে একটু আপনার সৌন্দর্য দেখায়ে আসুন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রথমে অনিহা প্রকাশ করলেন কিন্তু জুলেখার বিরোধীতার ভয়ে তিনি মহিলাদের সামনে তশরীফ নিয়ে গেলেন। ওসব মহিলারা যখন ইউসুফ আলাইহিস সালামের প্রতি তাকালো এবং ওনার অপূর্ব সৌন্দর্যের সাথে নাবুয়াত ও রেসালতের নূর, নম্রতা ও ভদ্রতার লক্ষন, রাজকীয় ভীতি ও মাহাত্ম্য দেখলো, তখন ওরা বিমোহিত হয়ে গেল এবং তাঁর মাহাত্ম্য ও ব্যক্তিত্ব ওদের মনে দারুন রেখা পাত করলো। তাঁর সৌন্দর্যে ওরা এত বিভোর হয়ে গেল যে চাকু দিয়ে লেবু কাটার পরিবর্তে নিজেদের হাত কেটে ফেললো, অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের প্রভাবে ওরা মোটেই কোন কষ্ট অনুভব করলো না। অতঃপর বিভোর অবস্থায় বলে উঠলো, নিশ্চয় ইনি মানুষ নয়, কোন ফিরিশ্তা হবে।
এবার জুলেখা ওদেরকে বললেন, দেখলেনতো ওনার সৌন্দর্য? এটাই সেই সুন্দর চেহারা, যার জন্য তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা করতে।
(কুরআন শরীফ ১২ পারা, ১৪ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৩৯পৃঃ)
সবক ঃ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সৌন্দর্যের আকর্ষণ এত ব্যাপক ছিল যে

দর্শনকারী মহিলারা চিৎকার দিয়ে উঠেছিল- এতো ফিরিশ্তা, মানুষ কখনোই হতে পারে না। যারা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের ও আমাদের সরতাজ হুজুর আহমদ মুখতার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৌন্দর্যের কোন পাত্তা দেয় না এবং তাদের মত মানুষই মনে করে, ওরা বড় জাহিল, বেআদব এবং মহিলাদের থেকেও অধম।

কাহিনী নং-১০৯

বাবুর্চী ও শরাব পরিবেশনকারী

জুলেখা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে কোনঠাসা করার ও তাঁর বশে আনার উদ্দেশ্যে যে কোন বাহানায় ওনাকে জেল খানায় পাঠিয়ে দিলেন। যেদিন ইউসুফ আলাইহিস সালাম জেলে গেলেন, সেদিন তাঁর সাথে আরও দু'জন যুবককেও জেল খানায় প্রবেশ করানো হয়। এ দু'জন মিসরের বাদশাহ আমলেকীর বিশিষ্ট অনুচর ছিল। একজন ছিল শরাব পরিবেশন কারী এবং অপর জন ছিল বাবুর্চী। উভয়ের বিরুদ্ধে বাদশাহকে বিষ প্রয়োগের অভিযোগ ছিল।
জেল খানায় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর জ্ঞান গরিমা প্রকাশ করতে লাগলেন। তিনি তথায় তৌহিদের প্রচার শুরু করলেন, এবং তিনি এটাও প্রকাশ করলেন যে, তিনি স্বপ্নের তাবীর খুবই ভাল বুঝেন। সেই দু'যুবক, যাদেরকে তাঁর সাথেই জেল খানায় ঢুকানো হয়েছিল, তারা তাঁর কাছে গিয়ে বললো, আজ রাত আমরা যে স্বপ্ন দেখেছি, সেটার তাবীর করুন।
শরাব পরিবেশন কারী বললো, আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি একটি বাগানে অবস্থান করছি এবং আমার হাতে আঙ্গুরের থোকা। আমি সেই থোকাগুলো মোচড়ায়ে শরাব তৈরী করছি।
বাবুর্চী বললো- আমি দেখলাম যে আমার মাথার উপর কিছু রুটি রাখা হয়েছে, যেগুলো পাখী এসে খাচ্ছে। এ স্বপ্নদ্বয়ের তাবীর কি হতে পারে, বলুন।
হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, হে শরাব পরিবেশনকারী, তোমাকে তোমার চাকুরীতে পুনঃবহাল করা হবে এবং আগের মত বাদশাকে শরাব পান করাবে। এবং হে বাবুর্চী, তোমাকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখীরা তোমার মাথা ঠুক্‌রে খাবে।
এ তাবীর শুনে উভয়ে বললো, আমরা তো কোন স্বপ্নই দেখিনি, আপনার সাথে এমনি রসিকতা করছিলাম। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, যেটাই হোক-তোমরা স্বপ্ন দেখেছ বা দেখ নাই কিন্তু আমি যেটা বলেছি সেটা বাস্তবায়িত হবে। আমার এ বক্তব্য কোন অবস্থাতেই পরিবর্তন হতে পারে না।
ঠিকই ইউসুফ আলাইহিস সালাম যা বলেছিলেন, তা-ই হয়েছে। শরাব পরিবেশনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমানিত হয়নি এবং সে স্বীয় চাকুরীতে বহাল হয়ে গেল। কিন্তু বাবুর্চী অভিযুক্ত হলো এবং ওকে শূলে দেয়া হলো। (কুরআন শরীফ ১৩পারা ১৫ আয়াত, রুহুল বয়ান ১৭পৃঃ ২জিঃ)
সবক ঃ এটা নবীগনের শান যে, ওনাদের পবিত্র মুখ থেকে যে কথাটি বের হয়, সেটা বাস্তবায়িত হয়। যারা বলে যে, রসূলের চাওয়ার দ্বারা কিছু হয় না, রসূল লাভ-ক্ষতির মালিক নয়, ওরা বড় জাহিল ও গুমরাহ্।

কাহিনী নং-১১০

বাদশাহের স্বপ্ন

মিসরের বাদশাহ আয়ান বিন ওলীদ আমলেকী এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলো যে, সাতটি রিষ্টপুষ্ট গাভী, যেগুলোকে সাতটি দুর্বল গাভী খাচ্ছে এবং সাতটি তরতাজা গমের শীষ যেগুলোকে সাতটি শুকনো শীষ খাচ্ছে। বাদশাহ এ অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। বড় বড় যাদুকর ও ভবিষ্যদ্বক্তার কাছে এ স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞেস করলেন, কিন্তু কেউ এ স্বপ্নের তাবীর করতে পারলো না।

বাদশাহের শরাব পরিবেশন কারী, যে জেল খানায় ছিল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের তাবীর মুতাবেক স্বীয় পদে বহাল হয়েছিল, সে বাদশাহকে বললো, জেলখানায় এমন একজন আলেম আছেন, যিনি স্বপ্নের তাবীর করার ব্যাপারে খুবই বিজ্ঞ। বাদশাহ ওকে বললো, তুমি ওর কাছে গিয়ে আমার স্বপ্নের তাবীরটা জিজ্ঞেস করে এসো। কথামত সে জেল খানায় গিয়ে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বললো, আমাদের বাদশাহ এ রকম স্বপ্ন দেখলেন, এর তাবীর কি হতে পারে? তিনি বললেন, এর তাবীর হচ্ছে, তোমরা সাত বছর লাগাতার ক্ষেত করবে এবং খুবই ফসল উৎপন্ন হবে। সাতটি মোটা গাভী ও সাতটি তরতাজা শীষের দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং এর পর সাত বছর মারাত্মক অভাব অনটন দেখা দেবে। ঐ সময় তোমরা আগের সাত বছরের জমাকৃত শস্য খাবে। সাতটি দুর্বল গাভী ও শুকনো শীষের দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এরপর এক বছর স্বাচ্ছন্দতা বিরাজ করবে। চারিদিকে সবুজের সমারোহ গড়ে উঠবে এবং বৃক্ষে খুবই ফল ধরবে।

শরাব পরিবেশন কারীর কাছ থেকে এ তাবীর শুনে বাদশাহ স্বস্তি বোধ করলেন এবং তার দৃঢ় ধারনা হলো যে এ তাবীরটাই সঠিক হতে পারে। স্বয়ং ইউসুফ আলাইহিস সালামের মুখ থেকে এ তাবীর শুনার জন্য বাদশাহের খুবই আগ্রহ হলো। তাই ইউসুফ আলাইহিস সালামকে বাদশাহের দরবারে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালো। ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে রাজ দূত গিয়ে যখন বললো, আপনাকে বাদশাহ তলব করেছেন, তখন তিনি রাজদূতকে বললেন, বাদশাহকে গিয়ে বলুন, প্রথমে আমার কেসটা যেন তদন্ত করে দেখেন; আমাকে বিনা কারণে জেল খানায় পাঠানো হয়েছে। রাজদুত এ খবর বাদশাহকে পৌছালে, বাদশাহ সবকিছু জেনে নিয়ে মিসরের মহিলাদেরকে তলব করলো এবং জুলেখাকেও ডাকা হলো। ওদের সবের কাছে ইউসুফ আলাইহিস সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে, সবাই এক বাক্যে স্বীকার করলেন যে আমরা ইউসুফের মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।

জুলেখাকেও বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হলো যে অপরাধ ওর ছিল, ইউসুফ আলাইহিস সালাম একেবারে নির্দোষ ছিলেন। এটা জানার পর বাদশাহের নির্দেশে খুবই ইজ্জত সম্মানের সাথে ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। (কুরআন শরীফ ১২ পারা ১৬ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৪২পৃঃ)

সবক ঃ নবীগনের জ্ঞান নিঁখুত। হক ও সত্যের জয় অবিসম্ভাবী।

কাহিনী নং ১১১

রাজমুকুট লাভ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে জেল থেকে মুক্তি দেয়ার পর, বাদশাহ আয়ান ইবনে ওলীদ খুবই সন্মানের সাথে তাঁকে তার পাশে সিংহাসনে বসালেন এবং যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সেটা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে নিজেই বর্ননা করলেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের পবিত্র মুখ থেকে এর তাবীর শুনলেন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম প্রথমে বাদশাহের দেখা স্বপ্ন সবিস্তারে বর্ননা করলেন। অতঃপর বিস্তারিত ভাবে পুরা স্বপ্ন হুবহু শুনায়ে দিলেন। এটা শুনে বাদশাহ আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বললো, স্বপ্নতো অদ্ভুত ছিল কিন্তু এর থেকে অদ্ভুত হলো আপনার হুবহু বলে দেয়াটা। যাহোক তাবীর শুনে বাদশাহ ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরামর্শ চাইলে, তিনি বললেন, এখন শস্য ভান্ডার গড়ে তোলা প্রয়োজন, স্বচ্ছলতার বছর গুলোতে অধিক কৃষি কাজ করে অধিক শস্য উৎপন্ন করে শস্য ভান্ডার গড়ে তোলা দরকার, প্রজাদের উৎপাদন থেকে এক পঞ্চমাংশ আদায় করে যা মওজুদ হবে, সেটা মিসর ও মিসরের আশে পাশের বাসিন্দাদের জন্য যথেষ্ট হবে। সাত বছর পর যখন দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন চারিদিক থেকে আল্লাহর বান্দারা আপনার কাছে শস্য ক্রয় করতে আসবে এবং আপনার কোষাগারে এত ধন সম্পদ পুঞ্জিভূত হবে, যা আপনার আগে কারো কাছে হয়নি। বাদশাহ বললো, এ বিশাল কোষাগারের সুষ্ট নিয়ন্ত্রন কে করবে? হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আপনার রাজ্যের সমস্ত কোষাগার আমার জিম্মায় দিন। বাদশাহ রাজি হয়ে গেল এবং বললো, আপনার থেকে অধিক উপযুক্ত আর কে হতে পারে? এরপর রাজ্যের সমস্ত সম্পদ ইউসুফ আলাইহিস সালামের কর্তৃত্তাধীনে দিয়ে দিল। এক বছর পর ইউসুফ আলাইহিস সালামকে ডেকে রাজমুকুট পরায়ে দিলেন, তলোয়ার ও মোহর হাতে দিলেন এবং সিংহাসনে বসায়ে স্বীয় রাজ্য তাঁকে হস্তান্তর করলেন। আজিজ মিসরকেও বরখাস্ত করে দিলেন এবং নিজে ও একজন সাধারণ প্রজার মত হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনুগত হয়ে গেল। (কুরআন শরীফ ১৩ পারা ১ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৪৩পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহতাআলা বড় বেনিয়াজ, ক্ষমতাবান, শক্তিমান ও দার্শনিক। তিনি তাঁর নবীগনকে অনেক এখতিয়ার, হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা ও পৃথিবীর সম্পদ রাজির উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও দীনের হেফাজতের জন্য জালিম বাদশাহ থেকে পদ দাবী করা ও গ্রহন করা জায়েয।

কাহিনী নং-১১২

ইউসুফ ও জুলেখা

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের বাদশাহ হয়ে গেলেন, সমগ্র মিসর তাঁর অধীনে এসে গেল। জুলেখার স্বামী আজিজ মিসর মারা গেল এবং জুলেখা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কিছু মনি মুক্তা সাথে নিয়ে এক জংগলে চলে গেল এবং সেখানেই একটি কুটীর বানিয়ে বসবাস করতে লাগলো। তখন তার সেই রূপ লাবন্য ও যৌবন বিলীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের উত্থান ও ক্ষমতার ডংকা বাজতে ছিল আর জুলেখা এক কিনারে অখ্যাত হয়ে পড়ে রইল। একদিন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সৈন্য সামন্ত সহ খুবই শান শওকতের সাথে সেই জংগল দিয়ে যাচ্ছিলেন। জুলেখা জানতে পেরে স্বীয় কুটীর থেকে বের হলো এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে রাজকীয় অবস্থায় গমন করতে দেখে হঠাৎ বলে উঠলো; سُبْحٰنَ مَنْ جَعَلَ الْمُلُوْكَ عَبِيْدًا بِالْمَعْصِيَةِ وَجَعَلَ الْعَبِيْدَ مُلُوْكًا بِالطَّاعَةِ. সেই জাত পাকের শান, যিনি নাফরমানীর কারনে বাদশাহদেরকে গোলামে পরিণত করেছেন এবং আনুগত্যের বদৌলতে গোলামদেরকে বাদশাহ বানিয়ে দিয়েছেন।

জুলেখার এ উক্তি শুনে ইউসুফ আলাইহিস সালাম কেঁদে দিলেন এবং এক অনুচরকে বললেন- এ বুড়ীর হাজত পূর্ণ করে দাও। অনুচর জুলেখার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো-হে বুড়ী; তোমার কি হাজত? সে বললো আমার হাজত ইউসুফই পূর্ণ করতে পারবে।

এতএব সেই অনুচর জুলেখাকে শাহী মহলে নিয়ে আসলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম রাজ প্রাসাদে আসার পর রাজকীয় পোষাক খুলে আল্লাহর ইবাদত করার উদ্দেশ্যে স্বীয় জ য়নামাযে বসলেন। তখন বুড়ীর সেই উক্তিটা ঃ-

سُبْحٰنَ مَنْ جَعَلَ الْمُلُوْكَ عَبِيْدًا وَجَعَلَ الْعَبِيْدَ مُلُوْكًا.

বুড়ীর হাজত পূর্ণ করা হয়েছে কি না? সে তাঁর মনে পড়লো এবং কাঁদতে লাগলেন। অনুচরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, সেইবললো, হুজুর সেই বুড়ী এখানে এসে গেছে এবং সে বলে যে, ওর হাজত তো ইউসুফ নিজেই পূর্ণ করবেন। বললেন, ঠিক আছে, ওকে এখানে নিয়ে এসো। জুলেখাকে হাজির করা হলো এবং সে সালাম পেশ করলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মাথানত অবস্থায় সালামের জবাব দিলেন এবং বললেন, হে মহিলা, তোমার কি হাজত বল। সে বললো, হুজুর আপনি কি আমাকে ভুলে গেছেন? বললেন, তুমি কে? সে বললো, হে ইউসুফ আমি জুলেখা। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এটা শুনে বলে উঠলেনঃ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الَّذِىْ يُحْيِىْ وَهُوَ حَىٌّ لَا يَمُوْتُ

আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, যিনি জীবিত করেন এবং তিনি চির জীবিত, কখনও মৃত্যু বরণ করেন না। অতপর ইউসুফ আলাইহিস সালাম জুলেখাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার যৌবন,

রূপ লাবন্য ও ধন সম্পদ কোথায় গেল? জুলেখা জবাব দিল, সেই নিয়ে গেল, যে আপনাকে জেলখানা থেকে বের করেছেন এবং মিসরের রাজত্ব দান করেছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, যাক, এখন বল, তোমার কি হাজত? সে বললো, আপনি কি পূর্ণ করবেন? প্রথমে ওয়াদা করুন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, নিশ্চয় পূর্ণ করবো। সে বললো, তাহলে শুনুন, আমার তিনটি হাজত রয়েছে ঃ

প্রথম হাজত হচ্ছে, আপনার বিচ্ছেদ ও বিরহ বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছি। আল্লাহর কাছে দুআ করুন যেন আমার দৃষ্টি শক্তি ফিরায়ে দেন।

দ্বিতীয় হাজত হচ্ছে, আমি যেন আমার সৌন্দর্য ও যৌবন ফিরে পাই।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম দুআ করলেন এবং সে আগের মত যুবতী ও রূপসী হয়ে গেল।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস জিজ্ঞেস বললেন, বল, এখন তোমার তৃতীয় হাজত কি?

সে বললো, হে ইউসুফ, তৃতীয় হাজত হচ্ছে আপনি আমাকে বিবাহ করুন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং মাথা নিচু করে ফেললেন। কিছুক্ষন পর হযরত জিব্রাইল আমীন হাজির হলেন এবং বললেন, হে ইউসুফ আপনার প্রভূ আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলেছেন-জুলেখা যে হাজত পেশ করেছে, সেটা পূর্ণ করার ব্যাপারে কার্পন্য কর না। ওর দুটি হাজত তোমার দুআয় আমি পূর্ণ করেছি। ওর এ তৃতীয় হাজতটি তুমি পূর্ণ করে দাও।

که ماعجز زليخا را چو ديديم !! بتو عرض نيازش را شنيدم !!

دلش از تيغ نو ميدى نختيم !! بتو بالائے عرشش عقدبستيم !!

হে ইউসুফ আমি তোমার সাথে ওর বিবাহ আরশে সম্পন্ন করে দিয়েছি। অতএব তুমি ওকে বিবাহ করে নাও। দুনিয়া আখেরাতে সে তোমার স্ত্রী।

অতঃপর হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে জুলেখাকে বিবাহ করলেন এবং আসমান থেকে ফিরিশতাগন এসে মুবারকবাদ দিলেন। জুলেখা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কাছে এ কথাটিও প্রকাশ করে দিলেন যে আজিজ মিসর মহিলার অনুপযুক্ত ছিল। আল্লাহতাআলা আমাকে আপনার জন্য মাহফুজ রেখেছেন। জুলেখার ঘরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহন করেন, একজনের নাম আফরাইম এবং অপর জ নের নাম মিশা এবং উভয়ই অপূর্ব সুন্দর ছিলেন।

(রুহুল বয়ান ১৮২-১৮৪পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের জন্য জুলেখার কুমারিত্বকে অক্ষুন্ন রেখেছিলেন যদিওবা ওর সাথে আজিজ মিসরের বিবাহ হয়েছিল। আজকাল যারা আমাদের প্রিয় নবীর মাহবুবা হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর নামে অপবাদ দেয়, তাদের থেকে বড় গোমরাহ, মূর্খ আর কেউ নেই। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে জুলেখার

বিবাহ আরশের উপর হয়েছে। অতঃপর পৃথিবীতে হয়েছে এবং তারই গর্ভে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের দু'সন্তানও জন্ম হয়েছে।

কাহিনী নং-১১৩

মহা দুর্ভিক্ষ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম মিসরের বাদশাহ হয়ে গেলেন এবং তিনি দেশে ন্যায় বিচার ও আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং আসন্ন দুর্ভিক্ষের কথা স্মরন রেখে বড় বড় শস্য ভান্ডার গড়ে তুললেন। অতঃপর দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার শুরু হলো। সমগ্র দেশ মহা মছিবতে পতিত হলো। চারিদিক থেকে লোকেরা শস্য ক্রয় করার জন্য মিসর আসতে লাগলো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম কাউকে এক উট বোঝাই এর অতিরিক্ত শস্য দিচ্ছিলেন না যেন সবাইকে সাহায্য করা যায়। কেনান শহরও এ মহা দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হয়েছিল। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বিন ইয়ামিনকে বাদ দিয়ে তাঁর দশ ছেলেকে খাদ্য শস্য ক্রয় করার জন্য মিসর পাঠালেন। যখন এ দশ ভাই হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওদেরকে দেখে চিনে ফেললেন। কিন্তু ওরা হযরত ইউসুফকে চিনতে পারলো না। কেননা ওদের ধারনা ছিল যে এ দীর্ঘ সময়ে ইউসুফ আলাইহিস সালাম মারা গেছেন বা শাহী পোষাক পরিহিত থাকায় ওরা কল্পনাও করতে পারে নাই যে, ইনি হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। এ দশ ভাই ইবরানী ভাষায় ইউসুফ আলাইহিস সালামের সাথে কথাবার্তা বললেন এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামও ইবরানী ভাষায় উত্তর দিলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? ওরা বললো, আমরা সিরিয়া থেকে এসেছি। আমরা মহা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছি। তাই আপনার কাছ থেকে খাদ্য শস্য ক্রয় করতে এসেছি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা গোয়েন্দা নয়তো? ওরা কসম করে বললো, আমরা গোয়েন্দা নই। আমরা সবাই আপন ভাই এবং এক বাপের সন্তান। আমাদের পিতা বড় বুজুর্গ ব্যক্তি। তাঁর নাম হযরত ইয়াকুব(আলাইহিস সালাম) এবং তিনি আল্লাহর নবী। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কয় ভাই? ওরা বললো, আমরা বার ভাই ছিলাম। কিন্তু এক ভাই আমাদের সাথে জংগলে গেলে ওখানে হারিয়ে যায় এবং সে আব্বাজানের খুবই আদরের ছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এখানেতো তোমাদের দশ জনকে দেখতেছি। আর এক জন কোথায়? ওরা বললো, সে আব্বাজানের কাছে আছে। আমাদের যে ভাইটি মারা গেছে, সে হলো ওর আপন ভাই। তাই আমাদের আব্বাজান ওকে কাছে রেখে কিছুটা শান্তনা লাভ করেন।

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদেরকে খুবই সন্মান করলেন এবং যথেষ্ট মেহমানদারী করলেন। অতঃপর প্রত্যেক ভাই এর উট বোঝাই খাদ্য শস্য দিলেন। পথে যাতে কোন অসুবিধা না হয়,সে জন্য খাবার সামগ্রীও দিলেন এবং বিদায় কালীন সময়ে বললেন, আগামীবার আসার সময় তোমাদের সেই ভাইকেও নিয়ে আসিও। তখন তোমরা একটি উট বোঝাই খাদ্য

শস্য অতিরিক্ত পাবে আর ওকে সাথে আনতে না পারলে, তোমরা আমার কাছে আসিওনা, তোমাদেরকে কিছুই দেয়া হবে না। এ দিকে তিনি তাঁর অনুচরদেরকে বললেন, খাদ্য শস্যের মূল্য বাবত ওরা যে টাকা দিয়েছে, সেটা ওদের শস্যের মধ্যে রেখে দাও।

ওরা দশ ভাই খাদ্য শস্য নিয়ে কেনান ফিরে আসলো এবং হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে মিসরের বাদশাহ ও তাঁর আচার-ব্যবহারের ভুয়সী প্রশংসা করলো।

এরপর যখন খাদ্যের বস্তা খুললো, তখন বস্তার মধ্যে তাদের সেই প্রদেয় টাকা দেখতে পেয়ে তারা ভীষন অভিভুত হলো এবং বললো, আব্বাজান! এ বাদশাহতো বড় উদার ও দানশীল। দেখুন, খাদ্য শস্যও দিয়েছেন এবং মূল্যও ফেরত দিয়েছেন। আব্বাজান! তিনি আমাদেরকে এটাও বলেছেন যে, আমাদের ভাই, বিন ইয়ামিনকে যদি আমাদের সাথে নিয়ে যাই, তাহলে ওকেও ওর ভাগের শস্য দিবেন। অতএব আব্বাজান, এবার বিন ইয়ামিনকেও আমাদের সাথে দিবেন যেন ওর ভাগের খাদ্য শস্যও পাওয়া যায়। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, এর আগে বিন ইয়ামিনের ভাই ইউসুফকে তোমাদের সাথে পাঠিয়েছিলাম। এখন একেও তোমাদের সাথে পাঠিয়ে কিভাবে তোমাদের উপর নির্ভর করতে পারি? ওরা বললো, আব্বাজান! আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, নিশ্চয়ই ওর হেফাজত করবো। ওকে নিশ্চিন্তে আমাদের সাথে দিন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, ঠিক আছে, আল্লাহ হেফাজতকারী, ওকে নিয়ে যাও। অতঃপর এরা বিন ইয়ামিনকে নিয়ে পুনরায় মিসরে গেল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের দরবারে হাজির হয়ে বললো, জনাব আমাদের একাদশ ভাইকেও আমাদের সাথে নিয়ে এসেছি। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম খুবই খুশী হলেন এবং ওদের সাদর সম্ভাষন জানালেন এবং শাহী ভোজের ব্যবস্থা করে এক লম্বা দস্তরখানা বিছায়ে সামনা সামনি দু'জন দু'জন করে বসতে বললেন, ওরা দশ ভাই দু'জন দু'জন করে বসে গেলেন। কিন্তু বিন ইয়ামিন একাকী রয়ে গেল। সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে মনে মনে বললো, আজ যদি আমার আপন ভাই ইউসুফ জীবিত থাকতো, তাহলে সে আমার সাথে বসতো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ওদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের এক ভাই একাকী রয়ে গেছে। তাই ওকে আমার সাথে বসাচ্ছি। অতএব বিন ইয়ামিনের সাথে তিনি নিজেই বসে গেলেন এবং ওকে বললেন, তোমার হারানো ভাই ইউসুফের জায়গায় যদি আমি তোমার ভাই হয়ে যাই, তাহলে কি তুমি পছন্দ করবে? বিন ইয়ামিন বললো, সুবহানাল্লাহ! আপনার মত যদি ভাই পাওয়া যায়, তাহলে বড় সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু ইয়াকুবের কলিজার টুকরা ও রাহিলের (ইউসুফ আলাইহিস সালামের মায়ের নাম) নয়ন মনি তো আর আপনি হতে পারেন না। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন এবং বিন ইয়ামিনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন আমিই তোমার আপন ভাই ইউসুফ। এরা যা কিছু করতেছে, এর জন্য মনঃক্ষুন্ন করনা। এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহ যে তিনি আমাদেরকে একত্রিত করেছেন। দেখ, এ রহস্যের কথা ভাইদেরকে বল না। বিন ইয়ামিন এ কথা শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

(কুরআন শরীফ ১৩ পারা ২ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৪৪পৃঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগন শত্রুতা কারীদের সাথেও ভাল ব্যবহার করেন এবং অপকারের বদলায় অপকার না করে উপকারই করে থাকেন।

কাহিনী নং-১১৪

পান পাত্র নিখোঁজ

বিন ইয়ামিন তাঁর দশ ভাই সহ যখন মিসরে পৌঁছলো, তখন মিসরের বাদশাহ তাদের খুব সমাদর করলেন। একটি শাহী ভোজেরও আয়োজন করলেন। উক্ত ভোজে মিসরের বাদশাহ বসলেন বিন ইয়ামিনের সামনা সামনি এবং ওর কাছে এ রহস্য প্রকাশ করে দিলেন যে তিনি তার ভাই ইউসুফ। বিন ইয়ামিন এ কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলো এবং ভাইকে বললো, ভাইজান! যে কোন উপায়ে আমাকে আপনার কাছে রেখে দিন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, ঠিক আছে দেখা যাবে।

ইউসুফ আলাইহিস সালাম সব ভাইদেরকে এক এক উট বোঝাই খাদ্য শস্য দিলেন এবং বিন ইয়ামিনের জন্যও এক উট বোঝাই খাদ্য শস্য প্রস্তুত করালেন। বাদশাহের পান পাত্রটি যেটা মহামূল্যবান মনি মুক্তা খচিত ছিল, খাদ্য শস্য মাপজোপের সময় হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম সকলের অগোচরে বিন ইয়ামিনের খাদ্য শস্যের মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার পর কাফেলা কেনানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো এবং শহরের প্রায় বাইরে চলে গিয়েছিল। এ সময় রাজ প্রাসাদের কর্মচারীরা সেই মুল্যবান পান পাত্রটি খুঁজে পাচ্ছিল না। তাদের ধারনা হলো কাফেলার লোকেরাই এটা নিয়ে গেছে। তখন তারা কালবিলম্ব না করে কয়েকজন লোককে কাফেলার মধ্যে তল্লাসী চালানোর জন্য পাঠিয়ে দিল। ওরা দৌঁড়ে এসে কাফেলার পথ রোধ করলো এবং বললো, শাহী পান পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না, আপনাদের উপর আমাদের সন্দেহ হয়েছে। ওরা বললো, খোদার কসম; আমরা এ রকম লোক নই। রাজ কর্মচারীরা বললো, ঠিক আছে, তল্লাসী করার সুযোগ দিন। তবে তল্লাসীর পর যার উটের হাওদায় সেটা পাওয়া যাবে, তার কি শাস্তি হওয়া উচিত? ওরা বললো,যার হাওদায় পাওয়া যাবে, ওকে আপনাদের কাছে রেখে দিবেন। সেমতে তল্লাসী করা হলো এবং পান পাত্র বিন ইয়ামিনের হাওদায় পাওয়া গেল। এতে ওরা দশ ভাই খুবই লজ্জিত হলো এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে নিয়ে গেলে। ওরা বললো, জনাব, প্রকৃতই যদি সে চুরি করে থাকে, তবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। ওর বড় ভাইও চুরি করেছিল। ইউসুফ আলাইহিস সালাম এ কথা শুনে সবর করলেন এবং রহস্য উদঘাটন করলেন না।

দশ ভাইয়েরা যখন দেখলেন যে, বিন ইয়ামিনকে রেহাই দিবে না, তখন তারা বলতে লাগলো, আমাদের আব্বাজান খুবই বৃদ্ধ এবং বিন ইয়ামিনকে অত্যন্ত ভালবাসেন। তাই আপনি আমাদের কাউকে আটক রেখে ওকে ছেড়ে দিন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমি ওকেই আটক করবো, যার হাওদায় আমার জিনিস পাওয়া গেছে। ওর পরিবর্তে অন্যকে আটক করা জুলুম হবে।

অবস্থা বেগতিক দেখে দশ ভাই নিজেদের মধ্যে শলা-পরামর্শ করতে লাগলেন যে এখন কি করা যায়। ওদের সবার বড় জন বললো, আমি আব্বাজানের কাছে বিন ইয়ামিনের নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়ে এসেছি। এখন বিন ইয়ামিনকে না নিয়ে কিভাবে তাঁর সামনে গিয়ে

দাঁড়াবো। তাই আমি এখানে রয়ে যাচ্ছি। তোমরা গিয়ে আব্বাজানকে সমস্ত কাহিনী খুলে বলিও। কথামত বড় ভাই মিসরে রয়ে গেল, অন্যান্য ভাইয়েরা কেনান ফিরে এসে আব্বাজানকে সমস্ত ঘটনা বর্ননা করলেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সমস্ত ঘটনা শুনে বললেন, আমি এবারও ধৈর্য ধারণ করবো এবং অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহতাআলা আমাকে ওদের তিন জনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবেন। এ বলে তিনি আলাদা হয়ে ইউসুফের ধ্যানে মগ্ন হয়ে গেলেন। ছেলেরা গিয়ে বললো, আব্বাজান! আপনি কি সদা ইউসুফের ধ্যানে মগ্ন থাকবেন? তিনি বললেন, আমিতো আমার দুঃখের ফরিয়াদ কেবল আল্লাহর কাছেই করতেছি। শুনো, যাকিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি জানি, তা তোমরা জান না। তোমরা বের হয়ে পড় এবং ইউসুফ ও তার ভাই এর অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না।

(কুরআন শরীফ ১৩ পারা, ৪ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৪৮পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণ সব সময় যে কোন ব্যাপারে সবর ও শুকরীয়া জ্ঞাপন করেন। হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের এটা জানা ছিল যে, ইউসুফ আলাইহিস সালাম জীবিত আছেন। এ জন্যই তিনি বলেছেন যে, অদূর ভবিষতে আল্লাহ তাআলা আমাকে ওদের তিন জনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দিবেন। ওরা তিনজন হচ্ছেন- বিন ইয়ামিন, বড় ভাই, যিনি মিসরে রয়ে গেছেন এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। এ জন্যই তিনি বলেছিলেন যে, যা কিছু আমি জানি, তা তোমরা জান না। যারা বলে যে, ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ইউসুফ আলাইহিস সালামের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না, ওরা বড় মূর্খ ও জাহিল।

কাহিনী নং-১১৫

রহস্য উদঘাটন

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম আপন সন্তানদেরকে বললেন-আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না এবং ইউসুফের সন্ধান কর। সুতরাং ওরা পুনরায় মিসর গেল এবং ইউসুফ আলাইহিস সালামের খেদমতে হাজির হয়ে বলতে লাগলো, হে মিসরের অধিপতি! আমরা খুবই মুছিবতে আছি, আমাদের নগন্য পুঁজি গ্রহন করে অধিক খাদ্য শস্য প্রদান করুন এবং রিলিফ হিসেবেও কিছু দিন। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের এ অনুনয় বিনয় শুনে ও দুঃখ ভারাক্রান্ত দেখে বললেন, তোমাদের কি স্মরণ আছে, তোমরা ইউসুফ ও ওর ভাই এর সাথে কি আচরণ করেছ? অর্থাৎ ইউসুফকে মারধর করা, কূপে ফেলে দেয়া, বিক্রি করা এবং এর পরে ওর ভাইকে জ্বালাতন করা, কষ্ট দেয়া এসব কিছু স্মরণ আছে? এটা বলার পর কি যেন মনে পড়ে হঠাৎ ইউসুফের হাসি এসে গেল। তখন ভাইয়েরা হযরত ইউসুফের দাঁতের সৌন্দর্য দেখে দৃঢ় ধারনা হলো যে, এ ইউসুফের অনুরূপ। তারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলো, আপনিই কি ইউসুফ? বললেন, হ্যাঁ, আমিই ইউসুফ এবং এ আমার ভাই বিন ইয়ামিন। আল্লাহতাআলা আমাদের উপর বড় ইহসান করেছেন। আল্লাহতাআলা পরহিজগার ও ধৈর্যশীল বান্দাদের প্রাপ্য প্রতিদান বিনষ্ট করেন না।

ভাইয়েরা লজ্জায় মস্তকাবনত হয়ে বললো, খোদার কসম, নিশ্চয় আল্লাহতাআলা আপনাকে

আমাদের উপর ফযীলত দিয়েছেন এবং আমরা বাস্তবিকই অপরাধী। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, ভাইয়েরা! আমার পক্ষ থেকে তোমাদের উপর কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে মাফ করুক। তিনি বড় মেহেরবান।
(কুরআন শরীফ ১৩ পারা ৪ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৪৯পৃঃ)
সবক ঃ আল্লাহের মকবুল বান্দাগনের এটা স্বভাব যে, ওনারা কারো থেকে বৈধ বদলা নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও মাফ করে দেন এবং কোন রকম তিরষ্কার করেন না।

কাহিনী নং-১১৬

ইউসুফের কামীছ

হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম ভাইদের কাছে আত্ম পরিচয় প্রকাশ করার পর তাঁর আব্বাজান হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের শারীরিক অবস্থার কথা জিজ্ঞেস করলেন। ওরা বললো, আপনার বিরহে তিনি কাঁদতে কাঁদতে অন্ধ হয়ে গেছেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম বললেন, আমার এ কামীছটা নিয়ে যাও। এটা আব্বাজানের মুখের উপর রাখিও, ইনশাআল্লাহ, তাঁর দৃষ্টি শক্তি ফিরে আসবে। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের কামীছটির এ শান ছিল যে, কোন রোগীর উপর রাখলে, সে আরোগ্য হয়ে যেত। যাহোক, ওরা কামীছটা নিয়ে রওনা হলো। ইউসুফকে কূপে নিক্ষেপের পর ওনার রক্তমাখা কামীছ যে ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, সে বললো - ঐ দিনও আমি ইউসুফের রক্তমাখা কামীছ নিয়ে গিয়েছিলাম এবং আব্বাজানকে কষ্ট দিয়েছিলাম। আজও আমি ইউসুফের কামীছ নিয়ে যাচ্ছি। তবে এবার আব্বাজানকে সন্তুষ্ট করবো। অতঃপর ওরা কেনানের পথে যাত্রা দিল। এ দিকে ওরা মিসর থেকে যাত্রা দিল। ঐ দিকে ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পরিবার পরিজন ও আত্মীয় স্বজনকে বলতে লাগলেন-আজ আমি ইউসুফের গন্ধ পাচ্ছি। ওনারা বললো, আপনি সেই পুরানো স্মৃতি নিয়েই মগ্ন আছেন। এখন আর ইউসুফ কোত্থেকে আসবে?
ইত্যবসরে ইউসুফের ভাইয়েরা এসে গেল এবং সেই কামীছটি ইয়াকুব আলাইহিস সালামের মুখের উপর রাখলো। সাথে সাথে তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পেলেন। তিনি আল্লাহতাআলার শুকরিয়া জ্ঞাপন করার পর বললেন, আমি কি বলতাম না যে, আমি যা কিছু জানি, তা তোমরা জাননা। (কুরআন শরীফ ১৩ পারা ৫ আয়াত, রুহুল বয়ান ২০৫ পৃঃ ২ জিঃ)
সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণের নূরানী শরীরের সংস্পর্শে যে জিনিস আসে, সেটা বলা মছীবত দূরীভূত কারী ও শেফাদান কারী হয়ে যায়। তাহলে আল্লাহওয়ালাগণ স্বয়ং কেন বলা মছীবত দমনকারী হবেন না এবং ওনাদেরকে বলা মছিবত দমনকারী বলাটা শিরক কি করে হতে পারে?

কাহিনী নং-১১৭

পুনঃ মিলন

হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামের চক্ষুদ্বয় ইউসুফ আলাইহিস সালামের কামীছের বরকতে

ভাল হয়ে গেল এবং ইয়াকুব আলাইহিস সালাম ফজরের সময় নামাজের পর হাত উঠায়ে আল্লাহর দরবারে তাঁর সন্তানগনের জন্য দুআ করলেন এবং সেটা গৃহীত হলো। আল্লাহতাআলা হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালামকে ওহীর মারফতে জানিয়ে দিলেন যে, ছেলেদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। এদিকে ইউসুফ আলাইহিস সালাম তাঁর পিতাকে পরিবার পরিজন সহ নিয়ে আসার জন্য দু'শত ঘোড় সওয়ার এবং অনেক জিনিসপত্র পাঠালেন।
হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম পরিবার পরিজন নিয়ে রওয়ানা হলেন। তাঁরা নারী-পুরুষ মিলে সর্বমোট বাহাত্তর জন ছিলেন। যখন ইয়াকুব আলাইহিস সালামের কাফেলা মিসরের কাছাকাছি পৌঁছলো, তখন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম অভ্যর্থনার জন্য হাজার হাজার সৈন্য সহকারে এগিয়ে গেলেন। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম হযরত ইউসুফের বাহিনীকে দেখে তাঁর ছেলে ইয়াহুদাকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি ফিরাউনের বাহিনী, যারা এত শান-শওকতের সাথে আসতেছে? ইয়াহুদা বললো, তা নয়, এটা আপনারই সন্তান ইউসুফের বাহিনী। একই সময় জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এসে আরয করলেন, হুজুর! উপর দিকে তাকিয়ে দেখুন: আজকের এ আনন্দ মিছিলে ফিরিশ্তাগণও অংশ গ্রহন করেছেন, যারা আপনার সেই শোকের সময় ক্রন্দন করতেন। ফিরিশতাগণের জিকির, ঘোড়াগুলোর ক্ষুরের শব্দ ও রাজ বাহিনীর গগন বিদারী শ্লোগানে চারিদিক মূখরিত হয়ে উঠলো। এ সময়টা ছিল মোহরমের দশ তারিখ। পিতা-পুত্র যখন সামনা-সামনি হলেন, ইউসুফ আলাইহিস সালাম সালাম পেশ করতে চাইলেন কিন্তু জিব্রাইল আলাইহিস সালাম বাঁধা দিলেন এবং বললেন, আব্বাজানকে সুযোগ দিন। তখন ইয়াকুব আলাইহিস সালাম বললেন, হে দুঃখ লাঘবকারী, আস্সালামু আলাইকুম। এরপর উভয়ে কোলাকুলি করলেন এবং খুবই ক্রন্দন করলেন। অতঃপর সুসজ্জিত অভ্যর্থনা শিবিরে কিছুক্ষন বিশ্রামের পর মিসরের রাজ প্রাসাদে নিয়ে আসলেন। ইউসুফ আলাইহিস সালাম সিংহাসনে বসার পর তাঁর বাবা-মাকে তাঁর পাশে বসালেন। ইউসুফ আলাইহিস সালামের এ শান-শওকত ও উচ্চ মান মর্যাদা দেখে, তাঁর পিতামাতা ও সমস্ত ভাইয়েরা তাঁর সন্মানে সিজদায় পতিত হলেন এবং সেই স্বপ্ন, যেটা ইউসুফ আলাইহিস সালাম দেখেছিলেন যে, এগারটি তারকা ও চন্দ্র-সূর্য তাঁকে সিজদা করছে, তা বাস্তবায়িত হলো। (কুরআন শরীফ ১৩ পারা ৫ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৩৫০পৃঃ)
সবকঃ মা-বাপের ইজ্জত সন্মান করা প্রত্যেকের আবশ্যক। তাজিমী সিজদা, যেটা ইউসুফ আলাইহিস সালামকে করা হয়েছিল, সেটা ওনাদের শরীয়তে জায়েয ছিল। আমাদের শরীয়তে এ সিজদা জায়েয নেই। অবশ্য আমাদের শরীয়তে মুছাফেহা, কোলাকুলি এবং হস্ত চুম্বন জায়েয।

কাহিনী নং-১১৮

অকালের ফল

হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের আম্মাজান গর্ভাবস্থায় মানত করেছিলেন যে, ওনার গর্ভের সন্তান ভুমিষ্ট হলে ওকে আল্লাহর খেদমতে দিয়ে দিবেন। অতঃপর তাঁর একটি কন্যা সন্তান জন্ম হয়, যার

নাম রাখা হয় মরিয়ম। তিনি তাঁর কন্যা সন্তানকে বায়তুল মুকাদ্দাসে নিয়ে গেলেন এবং মসজিদের খেদমতের জন্য ওখানে দিয়ে আসলেন। বায়তুল মুকাদ্দাসের মুতওয়াল্লীগণের মধ্যে হযরত যাকরীয়া আলাইহিস সালামও ছিলেন। তিনি মরিয়মের আপনজন ছিলেন। তাঁর স্ত্রী ছিলেন মরিয়মের খালা। এ জন্য মরিয়মকে তাঁর প্রযত্নে রাখলেন। যাকরীয়া আলাইহিস সালাম মরিয়মের জন্য মসজিদে একটি আলাদা কামরা তৈরী করান এবং মরিয়রকে একান্তভাবে তাঁর জিম্মায় রাখেন। তিনি ব্যতীত ঐ কামরায় অন্য কেউ যেতে পারতো না। তিনি যখন বাইরে যেতেন, তখন কামরার দরজা বন্ধ করে যেতেন এবং বাইর থেকে এসে নিজেই খুলতেন। হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালামের কারামত দেখুন, যাকরীয়া আলাইহিস সালাম যখনই কামরায় প্রবেশ করতেন, তখন সেই বন্ধ কামরায় হযরত মরিয়মের সামনে নানা রকম অকালের ফল মওজুদ দেখতেন। গ্রীষ্ম কালের ফল শীত কালে এবং শীত কালের ফল গ্রীষ্মকালে ওনার সামনে মওজুদ থাকতো। এ দৃশ্য দেখে যাকরীয়া আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে মরিয়ম, এ বন্ধ কামরায় তোমাকে এ ফল কে দিয়ে যায়? এবং এ অকালের ফল কোত্থেকে আসে? মরিয়ম আলাইহিস সালাম বললেন, এটা আল্লাহর কাছ থেকে আসে, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন, তাকে অগনিত প্রদান করেন।

হযরত যাকরীয়া আলাইহিস সালামের বয়স তখন পঁচাত্তর বছর থেকেও অধিক ছিল। মাথার চুল সাদা হয়ে গিয়েছিল, গলার আওয়াজ বসে গিয়েছিল এবং তাঁর কোন সন্তানও ছিলনা। তিনি চিন্তা করলেন যে আল্লাহতাআলা মরিয়মকে অকালের ফল দান করেন। তিনি চাইলে, আমাকেও এ বার্দ্ধক্য বয়সে আমার বন্ধ্যা স্ত্রীর গর্ভে সন্তান দিতে পারেন। এ ধারনায় মরিয়মের পাশে বসে দুআ করলেন, হে আল্লাহ, আমাকে তোমার কাছ থেকে একটি পুত পবিত্র সন্তান দান কর, নিশ্চয় তুমি দুআ কবুলকারী।

তাঁর এ দুআর পর হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম উপস্থিত হয়ে আরয করলেন, আল্লাহতাআলা আপনাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে আপনার ঘরে পুত্র সন্তান জন্ম হবে যার নাম হবে ইয়াহিয়া। (কুরআন শরীফ ৩ পারা ১২ আয়াত, রুহুল বয়ান ৩২৪ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ ওলীগনের কারামাত সত্য। মরিয়ম আলাইহিস সালামের সামনে অকালের ফল মওজুদ থাকাটা হলো ওনার কারামাত। যে জায়গায় আল্লাহওয়ালাগণ কদম রাখেন, ঐ জায়গা বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। ঐ জায়গায় বসে যে দুআ করেন তা আল্লাহ তাআলা সহসা কবুল করেন। এ জন্য যে জায়গায় মরিয়ম আলাইহিস সালাম ছিলেন, ঐ জায়গায় বসে যাকরীয়া আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন এবং সেটা কবুল হয়ে গেল। আল্লাহতাআলার অবহিত করনের দ্বারা গর্ভস্থিত সন্তানের খবরও নবীগন লাভ করেন। যেমন আল্লাহ তাআলা যখন সুসংবাদ দিলেন যে, তোমার ঘরে ইয়াহিয়া জন্ম হবে, তখন যাকরীয়া আলাইহিস সালাম জেনে গেলেন যে তাঁর স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান হবে।

কাহিনী নং-১১৯

আল্লাহর নিদর্শন

হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম একদিন নিজের কামরায় একাকী বসা ছিলেন, এমন সময় হযরত জিব্রাইল আমীন সুস্থ সবল মানব আকৃতিতে তাঁর কামরায় আসলেন। হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম তাঁর সামনে হঠাৎ অপরিচিত ব্যক্তি দেখে বলে উঠলেন, তুমি কে? এখানে কেন এসেছ? সাবধান, আল্লাহকে ভয় কর। আমি আল্লাহর কাছে তোমার থেকে পানাহ চাচ্ছি। জিব্রাইল আমীন বললেন, ভয় করোনা, আমি আল্লাহর দূত। তোমাকে একটি পবিত্র সন্তান দান করার জন্য আমি এসেছি। মরিয়ম বললেন, কি করে আমার সন্তান হবে, এখনও আমার বিবাহ হয়নি এবং কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শও করেনি। আমিতো অসৎ মহিলা নই। জিব্রাইল বললেন, তা ঠিক। কিন্তু আল্লাহতাআলা বলেন, বাপ ছাড়া সন্তান প্রদান আমার জন্য কোন অসাধ্য বিষয় নয়। আমি চাই, তোমার গর্ভে বাপ ছাড়া সন্তান জন্ম দিয়ে আমার রহমতের প্রতিফলন এবং জনগণের জন্য একটি নিদর্শন উপস্থাপন করতে এবং এটা হবেই। হযরত মরিয়ম এ কথা শুনে আশ্বস্থ হলেন। অতঃপর জিব্রাইল আমীন ওনার বুকের খোলা অংশে একটি ফুঁক দিলেন, এবং সাথে সাথে তিনি গর্ভবতী হয়ে গেলেন। স্বামীবিহীন গর্ভবতী হয়ে যাওয়াটা লোকদের জন্য বিষ্ময়ের কারণ হলো, তাঁর এ গর্ভধারনের খবর সর্বাগ্রে জানতে পারলেন তাঁর চাচাতো ভাই ইউসুফ নজ্জার, যিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের খাদেম ছিলেন। তিনি মরিয়মের ধর্মভীরুতা, পরহেজগারী, ইবাদত বন্দেগী ও সদা মসজিদে অবস্থানের কথা স্মরণ করে শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি লজ্জাশরম ত্যাগ করে মরিয়ম আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করে ফেললেন। কথাটি এভাবে শুরু করলেন, হে মরিয়ম, বীজ ছাড়া ক্ষেত, বৃষ্টি ছাড়া বৃক্ষ এবং পিতা ছাড়া সন্তান জন্ম হতে পারে? মরিয়ম আলাইহিস সালাম জবাবে বললেন, তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহতাআলা সর্বপ্রথম যে ক্ষেত উৎপন্ন করেছেন সেটা বীজ ছাড়া করেছেন, স্বীয় কুদরতে বৃষ্টি ব্যতীত বৃক্ষ জন্মায়েছেন। কি জানা নেই যে আল্লাহতাআলা আদম ও হাওয়াকে মা-বাপ ছাড়া সৃষ্টি করেছেন? ইউসুফ বললেন, নিশ্চয় আল্লাহতাআলা সব বিষয়ে ক্ষমতাবান, আমার সন্দেহ দুরীভূত হয়ে গেল।

এরপর স্বীয় কউম থেকে আলাদা হয়ে দূরে কোথাও চলে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মরিয়ম আলাইহিস সালামের প্রতি ইলহাম করা হলো। তাই তিনি দূরে চলে গেলেন। যখন প্রসব বেদনা শুরু হলো, তখন তিনি একটি শুকনো খেজুর বৃক্ষে হেলান দিয়ে বসে গেলেন এবং অপমান ও বদনামের ভয়ে নিজে নিজে বললেন, হায়, এর আগে যদি মারা যেতাম এবং মানুষের স্মৃতিপট থেকে মুছে যেতাম। এ ধরনের কথা বলার সময় অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ আসলো-হে মরিয়ম! নিজের একাকীত্ব, লোকদের কানাঘুষা ও খানাপিনার কোন চিন্তা করোনা। তোমার প্রভু তোমার নিচে একটি নদী প্রবাহিত করেছেন এবং তোমার হেলান দেয়া খেজুর বৃক্ষের শিকড় ধরে নাড়া দাও। মরিয়ম আলাইহিস সালাম যখন সেই বৃক্ষকে নাড়া দিলেন, তখন সাথে সাথে সেই বৃক্ষ তরতাজা হয়ে গেল এবং তাজা ফলও

ধরলো এবং পাকা খেজুর ঝড়তে লাগলো। অতঃপর যখন তাঁর গর্ভ থেকে হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম জন্মগ্রহন করেন, তখন অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো-ফলও খাও, পানিও পান কর এবং আপন নয়নমনি দ্বারা সান্তনাও লাভ কর। যখন তোমাকে কেউ এর ব্যাপারে প্রশ্ন করবে, তুমি নিজে জবাব দিওনা, বরং শিশুর দিকে ইঙ্গিত করিও।

যখন হযরত মরিয়ম আলাইহিস সালাম নবজাত শিশুকে নিয়ে স্বীয় কউমের কাছে ফিরে আসলেন, তখন লোকেরা কুমারী মরিয়মের কোলে শিশু দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল এবং বললো, হে মরিয়ম! তুমিতো সর্বনাশ করলে। তোমার মা-বাপতো এরকম ছিলনা। তুমি খুবই মারাত্মক কাজ করেছ। মরিয়ম আলাইহিস সালাম শিশুর দিকে ইশারা করে বললেন, আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করনা, যা বলার থাকে ওকে বল। লোকেরা একথা শুনে আরও রাগান্বিত হলো এবং বললো, এ দুগ্ধপোষ্য শিশু কি আমাদের সাথে কথা বলবে?

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম দুধ পান বন্ধ করলেন এবং স্বীয় বাম হাতের উপর ভার দিয়ে কউমের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন-শুনেন, আমি আল্লাহর বান্দা, আল্লাহ আমাকে কিতাব দান করেছেন এবং নবী বানিয়েছেন. নামাজ রোজার তাগিদ দিয়েছেন, এবং আমাকে মায়ের সাথে সৎ আচরণ কারী বানিয়েছেন, নাফরমান বানায়নি।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের এ বক্তব্যে ওরা আশ্চর্য ও নিশ্চুপ হয়ে গেল।

(কুরআন শরীফ ১৬ পারা ৫ আয়াত, খাযায়েনুল এরফান ৪৩৪ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহতাআলা সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। তিনি কোন মাধ্যমের মুখাপেক্ষী নন, যা ইচ্ছে করতে পারেন। উৎসকে কর্তা মনে করা বা উৎস ব্যতীত কোন কিছু করাকে আল্লাহর জন্য অসম্ভব মনে করাটা মূর্খতা ও কুফরীর পরিচায়ক। নূরানী মখলুক মানবীয় আবরন ধারণ করে আসলে আমাদের মত মানুষ হয়ে যায় না। এর মূল নূর পরিবর্তন হয় না। যেমন জিব্রাইল আমীন একজন সুস্থ সবল মানুষ রূপে আগমন করে ছিলেন কিন্তু তিনি আমাদের মত মানুষ ছিলেন না। বরং নূরই ছিলেন এবং নূরই আছেন। অনুরূপ আমাদের হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও যিনি সমস্ত নূরের উৎস, আমাদের কাছে মানুষের পোষাকে তশরীফ এনেছেন বলে আমাদের মত মানুষ কখনও ছিলেন না বরং তিনি নূরই ছিলেন এবং নূরই আছেন।

এটাও বুঝা গেল যে, আল্লাহর কোন নেয়ামত যার মাধ্যমে পাওয়া যায়, এ পাওয়াটা সেই মাধ্যমের দিকে ইঙ্গিত করাটা জায়েয। যেমন সন্তান দান করাটা আল্লাহর কাজ কিন্তু জিব্রাইল এ রকম বলেছেন-আমি এ জন্য এসেছি যেন তোমাকে এক পবিত্র সন্তান প্রদান করি।

যেহেতু মরিয়ম আলাইহিস সালাম সন্তান লাভ করেছিলেন জিব্রাইলের মাধ্যমে, সেহেতু কুরআন শরীফে সন্তান প্রদান করাটা জিব্রাইলের দিকে ইঙ্গিত করা হলো। তাই এ কথাটা এভাবে ঘোষনা করলেন-মরিয়মকে সন্তান জিব্রাইল দিয়েছেন। কুরআনের আয়াতের অর্থ মতে ঈসা আলাইহিস সালামের অপর নাম জিব্রাইল বখশ। এ রকম কোন আল্লাহওয়ালার দুআর বরকতে কোন কাজ হয়ে গেলে আমরা বলতে পারি যে এ কাজ অমুক বুজুর্গ করেছেন বা কোন পীর-মুরশেদের দুআর দ্বারা সন্তান লাভ করলে আমরা বলতে পারি যে, এ সন্তান অমুক পীর দিয়েছেন এবং সেই সন্তানের নাম পীর বখশ রাখা যেতে পারে।

আল্লাহর নবীগণের কাছে ভবিষ্যতের বিষয় গুলো আগে থেকেই জানা হয়ে যায়। এজন্য হযরত

ঈসা আলাইহিস সালাম শৈশবে সর্ব প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন, সেটা হচ্ছে, আমি আল্লাহর বান্দা অর্থাৎ তাঁর এটা জানা ছিল যে, তাঁকে লোকেরা আল্লাহ এবং আল্লাহর বেটা বলবে। তাই তিনি সর্বাগ্রে বান্দা বলে ঘোষনা দিলেন। ঈসা আলাইহিস সালামের জন্মের পর আল্লাহতাআলা শুকনো খেজুর গাছ থেকে তাজা খেজুর দান করেছেন। মিলাদ মাহফিলে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মিলাদের পর মিষ্টি বিতরন করলে এতে নিষেধ করার কি আছে?

কাহিনী নং-১২০

শাগরিদ, না ওস্তাদ?

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যখন একটু বড় হলেন এবং এদিক সেদিক ঘুরাফেরা করতে লাগলেন, তখন মরিয়ম আলাইহিস সালাম ওনাকে নিয়ে এক ওস্তাদের কাছে গেলেন এবং ওনাকে পড়াতে বললেন। ওস্তাদ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে বললেন, হে ঈসা! পড়, বিসমিল্লাহ। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন-বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। ওস্তাদ পুনরায় বললেন, বল আলিফ, বা, জীম, দাল। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি কি জানেন,এ বর্ণ গুলোর অর্থ কি? ওস্তাদ বললেন, এ বর্ণগুলোর অর্থ তো আমি জানিনা। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে আমার থেকে শুনুন। আলিফ দ্বারা আল্লাহ, বা দ্বারা অল্লাহর সন্তুষ্টি, জীম দ্বারা আল্লাহর জালালিয়াত এবং দাল দ্বারা আল্লাহর দীন বুঝানো হয়েছে। ওস্তাদ মরিয়ম আলাইহিস সালামকে বললেন, আপনি ছেলেটা নিয়ে যান। এ ছেলে কোন ওস্তাদের মূখাপেক্ষী নয়। আমি ওকে কি পড়াবো, সেতো আমাকে পড়াচ্ছে। (নজহাতুল মাজালিস ৪৩২ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ নবীগণ কোন দুনিয়াবী শিক্ষকের মোহতাজ হন না। ওনাদের ওস্তাদ ও প্রশিক্ষক স্বয়ং আল্লাহ। নবীগণ এমন অনেক অনেক বিষয়ে জ্ঞাত, যেগুলো সম্পর্কে অন্য লোকেরা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

কাহিনী নং-১২১

ঈসা আলাইহিস সালামের হস্ত মুবারক

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর শৈশব অবস্থায় তাঁর মায়ের সাথে এক শহরে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে দেখেন যে, শহরের লোকেরা বাদশাহের প্রাসাদের সামনে জমায়েত হয়ে আছে। ঈসা আলাইহিস সালাম এর কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, বাদশাহের স্ত্রীর সন্তান প্রসবের সময় হয়েছে কিন্তু সন্তান হচ্ছেনা। তাই লোকেরা সমবেত হয়ে তাদের মূর্তিদের কাছে এ কষ্ট থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য হু হা করে আরাধনা করছে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, আমার হাত যদি বাদশাহের বেগম সাহেবার পেটের উপর রাখার ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রসব হয়ে যাবে। লোকেরা এ কথা শুনে ঈসা আলাইহিস সালামকে বাদশাহের কাছে নিয়ে গেলেন। ঈসা আলাইহিস সালাম বাদশাহকে বললেন, হে বাদশাহ! আমি যদি এটাও বলি যে, বেগম সাহেবার পেটে ছেলে, না মেয়ে এবং পেটে হাত

রাখার সাথে সাথে যদি সন্তান প্রসব হয়ে যায়, তাহলে কি আপনি এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবেন? বাদশাহ বললো, নিশ্চয়। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, তাহলে শুনেন, ওনার পেটে পুত্র সন্তান রয়েছে, যার মুখমন্ডলে কালো তিল এবং পিঠে সাদা তিল রয়েছে। এরপর তিনি বললেন, হে শিশু! আমি তোমাকে সেই জাতে পাকের কসম দিচ্ছি, যিনি সমস্ত মখলুখকে সৃষ্টি করেছেন, তুমি তাড়াতাড়ি পেট থেকে বের হয়ে এসো। তাঁর এটা বলার সাথে সাথেই শিশু ভূমিষ্ট হল এবং সবাই দেখলো যে, ওর মুখমন্ডলে কালো তিল এবং পিঠে সাদা তিল রয়েছে। তাঁর এ অলৌকিক ক্ষমতা দেখে বাদশাহ মুসলমান হয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কিন্তু ওর কউম এটাকে যাদু বলে বাদশাহকে মুসলমান হওয়া থেকে বিরত রাখলো। (নজহাতুল মাজালিস ৪৩৩ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহর নবীগণ বিশাল জ্ঞান ভান্ডার ও ইখতিয়ার নিয়ে আগমন করেন। ওনাদের দৃষ্টি গর্ভের অভ্যন্তরে পর্যন্ত পৌছে যায় এবং ওনাদের হাত মুবারকও বালা মুছিবত দূরীভূতকারী হয়ে থাকে।

কাহিনী নং-১২২

অন্ধ ও লেংড়া চোর

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম তখনও অল্প বয়ষ্ক তাঁর মায়ের সাথে মিসরের এক বড় আমীরের সেখানে মেহমান হয়েছেন। সেই আমীরের সেখানে অনেক গরীব ও অভাবী ব্যক্তি সব সময় মেহমান হিসেবে থাকে। ঘটনাক্রমে একদিন আমীরের কিছু মাল চুরি হয়ে যায় এবং সেখানে অবস্থানকারী ফকীর মিসকিনদের উপর তার সন্দেহ হয়। ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর মাকে বললেন, আমীরকে বলুন, এসব লোকদেরকে যেন এক জায়গায় জমায়েত করা হয়। যখন সবাইকে এক জায়গায় জমায়েত করা হলো. হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম গিয়ে ওদের মধ্যে থেকে এক খোঁড়া ব্যক্তিকে উঠায়ে এক অন্ধ ব্যক্তির কাঁধের উপর বসায়ে দিলেন এবং বললেন, হে অন্ধ! এ খোঁড়া ব্যক্তিকে কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে যাও। সে বললো, আমি খুবই দুর্বল ও শক্তিহীন ব্যক্তি, ওকে কি করে উঠাতে পারি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, গতরাত্রে ওকে কাঁধে উঠানোর শক্তি তোমার কোত্থেকে এসেছিল? একথা শুনে অন্ধ কাঁপতে লাগলো। আসলে এ অন্ধ সেই খোঁড়াকে কাঁধে উঠায়ে চুরি করেছিল। অতএব চোরদ্বয় ধরা পড়ে গেল।

(নজহাতুল মাজালিস ৪৩৩পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ আল্লাহর নবীগণ লুকায়িত বিষয় যা হয়েছে বা হবে, সব জেনে ফেলেন। নবীগনকে অজ্ঞ মনে করা অজ্ঞদের স্বভাব।

কাহিনী নং-১২৩

দুনিয়া-পূজারীর পরিণতি

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম একবার সফরে বের হলে এক ইহুদী তাঁর সফর সঙ্গী হয়েছিল। সেই ইহুদীর কাছে দুটি রুটি ছিল এবং ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে ছিল একটি রুটি। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম ইহুদীকে বললেন, এসো, আমরা দু'জন একসাথে বসে রুটি খাই। ইহুদী রাজি হলো কিন্তু যখন দেখলো যে ঈসা আলাইহিস সালামের কাছে মাত্র একটি রুটি আর ওর কাছে দুটি রুটি রয়েছে, তখন অনুশোচনা করলো যে, কেন একসাথে রুটি খাওয়ার ওয়াদা করলাম। যাহোক যখন খেতে বসলো, ইহুদী মাত্র একটি রুটি বের করলো। ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, তোমার কাছেতো দু'টি রুটি ছিল, আর একটি কোথায় গেল? ইহুদী বললো, আমার কাছেতো একটি রুটিই ছিল, দুটি কখন ছিল? খাবার খাওয়ার পর যখন যাত্রা দিলেন, রাস্তায় এক অন্ধের সাথে দেখা হলো। ঈসা আলাইহিস সালাম ওর জন্য দুআ করলেন, তখন সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। এ মুজেজা দেখিয়ে ঈসা আলাইহিস সালাম ইহুদীকে বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আমার দু'আয় এ অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছেন, সত্য সত্য বল, সেই রুটিটি কোথায় গেল? সে বললো, সেই আল্লাহর কসম, আমার কাছেতো একটি মাত্র রুটি ছিল। আরও কিছুদূর অগ্রসর হলে একটি হরিণ দেখা গেল। ঈসা আলাইহিস সালাম সেটাকে ডাকার সাথে সাথে সামনে এসে গেল। তিনি সেটাকে জবেহ করলেন এবং পাকায়ে খেলেন। অতঃপর হাড্ডিগুলোকে একত্রিত করে বললেন, আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। তখন সেই হরিণ জীবিত হয়ে গেল। এ মুজেজা দেখানোর পর ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর শপথ, যিনি আমাদেরকে এ হরিণ খাওয়ালেন এবং পুনরায় একে জীবিত করে দিলেন। সত্যি সত্যি বল, তোমার সেই রুটিটি কোথায় গেল? ইহুদী বললো, সেই আল্লার কসম. আমার কাছে অন্য কোন রুটি ছিলইনা। তাঁরা পুনরায় যাত্রা দিলেন এবং এক ছোট শহরে গিয়ে পৌছলেন, ঈসা আলাইহিস সালাম ওখানে অবস্থান করলেন। ইহুদী সুযোগ পেয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের লাঠিটা চুরি করে নিয়ে নিল এবং মনে মনে খুবই খুশী হলো যে সেও এ লাঠি দ্বারা মৃতকে জীবিত করতে পারবে। সে শহরে প্রচার করলো যে কেউ মৃতকে জীবিত করতে চাইলে, ওর দ্বারাই করাতে পারবে। লোকেরা ওকে শহরের শাসকের কাছে নিয়ে গেল যিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিল এবং বললো, এ রোগ থেকে ওনাকে আরোগ্য করে দাও। ইহুদী প্রথমে সেই শাসকের মাথায় লাঠি দ্বারা জোরে আঘাত করলো। এর ফলে সে মারা গেল। এরপর ইহুদী বললো, দেখুন, এখন আমি ওকে পুনরায় জীবিত করতেছি। এ বলে সে ওকে সেই লাঠি দিয়ে আঘাত করে বললো, আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও। কিন্তু সে জীবিত হলোনা। লোকেরা ওকে বন্দী করলো এবং ফাঁসী দেয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। ইত্যবসরে ঈসা আলাইহিস সালাম সেখানে পৌছে গেলেন এবং বললেন, তোমাদের শাসককে আমি জীবিত করে দিচ্ছি, ওকে ছেড়ে দাও। তিনি 'আল্লাহর হুকুমে উঠে যাও' বলার সাথে সাথে সেই শাসক জীবিত হয়ে গেল এবং লোকেরা ইহুদীকে ছেড়ে দিল। ঈসা আলাইহিস সালাম ওকে বললেন, তোমাকে সেই আল্লাহর কসম, যিনি তোমার প্রান রক্ষা করেছেন। সত্য সত্য বল, সেই দ্বিতীয় রুটিটি কোথায় গেল? সে বললো, সেই খোদার কসম, যিনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, দ্বিতীয় কোন রুটি আমার কাছে ছিলনা। তাঁরা পুনরায় পথ চলতে লাগলেন। কিছুদূর যাওয়ার পর তিনটি স্বর্ণের ইট পাওয়া

গেল। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বললেন, এ তিনটি ইটের মধ্যে একটি আমার, একটি তোমার এবং অবশিষ্টটি ওর, যে তৃতীয় রুটিটি খেয়েছে। সে বললো, হে ঈসা, খোদার কসম, তৃতীয় রুটিটি আমিই খেয়েছিলাম। তিনি ইট তিনটাই ওকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন এখন তুমি আমার সঙ্গ ত্যাগ কর। সে ইট তিনটা নিয়ে সানন্দে রওয়ানা হলো। কিন্তু পথে আল্লাহ তাআলা ওকে ইটসহ মাটিতে দাবিয়ে ফেললেন। (নজহাতুল মাজালিস ২০৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ দুনিয়া পূজারী সীমাহীন মিথ্যুক হয়ে থাকে এবং দুনিয়ার প্রেমে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কোন পরওয়া করেনা। এ ধরনের অপরিনামদর্শীদের পরিণতি খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে।

কাহিনী নং-১২৪

ব্যর্থ হত্যাকারী

ইহুদীরা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের বড় দুশমন ছিল। একদিন ইহুদীদের একটি দল হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে গালিগালাজ করলো এবং এ রকম বললো তুমি যাদুকর, তোমার মাও যাদুকর এবং তুমি অসৎ, তোমার মাও অসতী (মাযাল্লা)। এ কথায় হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম খুবই মনঃকষ্ট পেলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলেন-হে আল্লাহ! আমি তোমার নবী। এ সব লোকেরা আমাকে ও আমার মাকে যা-তা বলছে। হে আল্লাহ! ওদেরকে তোমার আজাবের মজা দেখাও। তাঁর এ দুআ কবুল হলো এবং সেই ইহুদীর দল বানর ও শুকুর হয়ে গেল। ইহুদীদের প্রধান যখন এ ঘটনার কথা শুনলো, তখন সে ঘাবড়িয়ে গেল যে, ঈসাতো আমার সবাইকে এ রকম বানায়ে ফেলতে পারে। এ ভয়ে সে সমস্ত ইহুদীদেরকে একত্রিত করলো এবং বললো, যে কোন উপায়ে ঈসাকে হত্যা করে ফেল। এদিকে জিব্রাইল আলাইহিম ঈসা আলাইহিস সালামকে জানিয়ে দিলেন যে, ইহুদীরা আপনাকে হত্যা করতে আসবে। আপনাকে জীবিত অবস্থায় আসমানে উঠায়ে নেয়া হবে। ঠিকই একদিন সকল ইহুদী একত্রিত হয়ে ঈসা আলাইহিস সালামের ঘর ঘিরে ফেললো এবং এক ব্যক্তিকে ঘরের ভিতরে পাঠালো যেন সে খোঁজ নেয় যে ঈসা ঘরে আছে কিনা। লোকটি যখন ঘরে ঢুকলো, তখন ওর আকৃতি হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের মত হয়ে গেল এবং ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহতাআলা আসমানের উপর উঠায়ে নিলেন। কিছুক্ষণ পর অন্যান্য ইহুদীরা যখন ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলো তখন নিজেদের সেই লোকটাকে ঈসা মনে করে হত্যা করে ফেললো। এরপর ওরা নিজেরা চিন্তা করতে লাগলো আমাদের যে লোকটি প্রথমে ঘরে প্রবেশ করেছিল, সে কোথায় গেল? যদি এ ঈসা হয়, তাহলে সে কোথায় গেল আর এ যদি সেই হয়, তাহলে ঈসা কোথায় গেল?

তাদের ধারনা মতে তারা ঈসা আলাইহিস সালামকে হত্যা করেছে। আসলে তা নয়। বরং তারা তাদের আপন লোককে হত্যা করেছে।ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানের উপর উঠায়ে নেয়া হয়েছে। (কুরআন শরীফ ৬ পারা ২ আয়াত, রুহুল বয়ান ৫১৩ পৃঃ ১ জিঃ)

সবক ঃ হযরত ঈসা আলাইহিস সালামকে আসমানে জীবিত উঠায়ে নেয়া হয়েছে। যারা মনে করে যে ওনাকে হত্যা করা হয়েছে বা উনি মারা গেছে, ওরা নিছক ধোকার মধ্যে আছে।